# হাঁপানি রোগ

মনীশ চন্দ্র প্রধান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

# হাঁপানি রোগ

ডাঃ মনীশ প্রধান
এম.ডি , টি ডি.ডি., এফ সি সি.পি।
সহকারী অধ্যাপক
আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
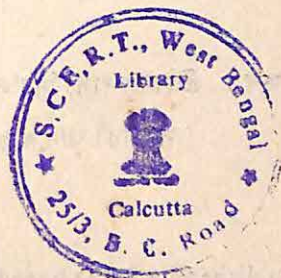
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

HAPANI ROG

by Dr. Manish Pradhan



প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৮৩

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )
আর্য ম্যানসন ( নবম তল )
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩



মুদ্রক : রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল দাস, নির্মল কর্মকার, দুর্গা রায়

[ সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত ]

Published by Sri Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in regional languages at the University level, launched by the Ministry of Education and Social Welfare ( Department of Culture ), Government of India, New Delhi.

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক

ডাঃ প্রশান্ত কুমার ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

## বিষয়সূচী :

# ভূমিকা

ডাঃ মনীশ প্রধানের লেখা 'হাঁপানি-রোগ' পুস্তকটির ভূমিকা লেখবার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

হাঁপানি বক্ষদেশের শুধু একটি অতি গুরুতর ব্যাধি নয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা প্রচুর কষ্ট পেয়ে থাকেন। এই রোগের কারণ নানাবিধ; আর আসল কারণটি নির্ণয় করতে পারা খুবই শক্ত। অনেক সময় একই রোগীর ক্ষেত্রে একাধিক কারণ থাকতে পারে। ডাঃ প্রধান যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে রোগের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি এই পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। রোগের কারণটি নির্ণয় করতে পারলে চিকিৎসা করা সহজ। এই ব্যাপারে রোগী ও তার পরিবারের অন্যান্য সভ্যেরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। কারণটি কি এবং তার উৎপত্তি হ'ল কি করে, তা জানতে ও বুঝতে এই বইটি সাহায্য করবে।

শিলপায়ণ ও জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাস ক্রমেই দূষিত হচ্ছে, হাঁপানির প্রকোপও বাড়ছে। এমনকি শিশুরাও নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। বহু রোগীরই এমন সব উপসর্গ দেখা দেয় যাতে তারা পঙ্গু হয়ে পড়ে, কর্মজীবন এবং পরমায়ুও হ্রাস পায়। এ রকম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ডাঃ প্রধান তাঁর এই পুস্তকে চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলি ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে রোগীরা তাঁদের কর্মজীবন এবং অন্যান্য অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে—যেমন, ধূমপান বন্ধ করে বা কমিয়ে দেহের উপর তার ক্রমবর্দ্ধমান কুফল বন্ধ করে প্রচুর উপকার পাবেন।

বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় লেখা খুবই কঠিন; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাতৃভাষাতে যে কোন বিষয়ই ভালভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সহজ। সহজ বাংলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পুস্তক রচনা করে এই গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকটি পূরণ করার জন্য ডাঃ প্রধানকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করছি, এই বইটি রোগী, জনসাধারণ, মেডিকেল ছাত্র ও প্রাকটিশনারদের উপকারে আসবে এবং বাংলাভাষী সকলের কাছে সমাদৃত হবে।

**প্রফুল্ল কুমার সেন**

এম ডি. (বার্লিন), পি এইচ.ডি. এবং টি.ডি.ডি. (ওয়েলস), এফ সি সি.পি. (ইউ.এস.এ), এফ.এ. এম এস, এফ এস এম.এফ., এফ আই.পি এইচ. এ.এফ. এন এ, ডাইরেক্টর, বি. সি. রায় যক্ষা এবং বক্ষ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাক্তন অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, মেডিকেল কলেজ এবং প্রধান, বক্ষ বিভাগ, কলেজ অব মেডিসিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩।১২।৮২

# মুখবন্ধ

কোন কারণে শ্বাসকষ্ট হলে আমরা তাকে হাঁপানি বলে মনে করি। কিন্তু হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে বহু কারণে ; সেই জন্য একে রোগ না বলে লক্ষণ বা উপসর্গ হিসাবে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। শ্বাসনলীর ভিতরের পরিবর্তনের জন্য এক ধরণের হাঁপানি হয় ; এই শ্বাসরোগ জনিত হাঁপানিকে অন্য ধরণের হাঁপানি থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ( Bronchial Asthma )।

হাঁপানি রোগ বহু পুরাতন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে এই রোগের বিবরণ, এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে এক প্রকার পাতার রস খাইয়ে হাঁপানি রোগ চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে গবেষণা করে জানা গিয়েছে, সেই রসে আছে এফিড্রিন (Ephedrine) জাতীয় ওষুধ।

এরপরে, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস-এর (Hippocrates, খৃঃ পূঃ 460-370 বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, হাঁপানি রোগ কি ভাবে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কি ভাবে সেরে যায়। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছিলেন যে, যখন রোগের আক্রমণ হয়, মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য শক্তি শ্বাসনলীকে চেপে ধরে। সেকালের সাধারণ মানুষ মনে করত এইরোগ বোধ হয় ভগবানের দেওয়া শাস্তি।

এরপরে হিপোক্রেটিস-এর মতবাদে দীক্ষিত গ্যালেন ( Galen 129—199 খৃঃ ) হাঁপানি রোগ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। গ্যালেন রোম সম্রাটের আমন্ত্রণে গ্রীসদেশ ছেড়ে রোমে চিকিৎসকের চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি সেকালে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, হাঁপানির সময় নাক দিয়ে যে জলীয় শ্লেষ্মা আসে, বা কাশির সঙ্গে যে কফ নির্গত হয়, তা আসে মস্তিষ্ক থেকে।তাঁর এই ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত ছিল। অবশ্য গ্যালেন-এর প্রতাপ এমনই হল যে সাহস করে কেউ তাঁর প্রতিবাদ করতে পারত না।

হাঁপানি রোগের কারণ ও চিকিৎসার জন্য কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমরা প্রথম জানতে পারি একজন ইতালীয় চিকিৎসকের বর্ণনার মাধ্যমে।

এ্যালার্জি খাদ্য ও পরিশ্রমের জন্য যে হাঁপানি হতে পারে এবং তার চিকিৎসার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন ইতালির পাভিয়া শহরের চিকিৎসক জেরোম কার্ডেন (Jerome Carden 1501-1576 খৃঃ)। কার্ডেনকে ইতালী থেকে এডিনবার্গ যেতে হয়েছিল সেন্ট এনড্রুজ-এর আর্কবিশপ জন হ্যামিলটন-এর চিকিৎসার জন্য আর্কবিশপ দশ বছর ধরে হাঁপানিতে ভুগছিলেন।(1) কার্ডেন আর্ক বিশপের কষ্ট দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিকমত পথ্য, পরিমিত পরিশ্রম ও ঘুমের জন্য যথাযথ পরামর্শ দিয়ে। ঘুমানর সময় তিনি পালকের তৈরী লেপ ও বালিশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। কার্ডেনের উপদেশে আর্কবিশপ উপকার পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। আজ মনে হয়, কার্ডেন বোধহয় তাঁর সময়ের বহু আগে জন্মেছিলেন।

পরবর্তীকালে বহু চিকিৎসক হাঁপানি রোগের কারণ, লক্ষণ, ব্যাধি প্রক্রিয়া, উপসর্গ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন যেমন স্যার জন ফ্লয়ার (Sir John Floyer-1649-1734 খৃঃ, হেনরি হাইড সল্টার (Henry Hyde Salter 1883-1871 খৃঃ) ফরাসী অধ্যাপক আরমান্দ ট্রুসো (Armand Trousseau 1801-1867 খৃঃ), নিজেরা ছিলেনহাঁপানি রোগী। তাঁরা যে ভাবে এই রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে উন্নততর বিবরণ আর কেউ দিতে পারেন নি।

প্রাচীন চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয়ে নির্ভর করতে হত রোগীর মুখে রোগ বর্ণনা শুনে ও নিজের চোখে রোগী দেখে। ফুসফুস, শ্বাসনলী বা রক্তে কি ধরণের পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে তাঁদের জানা সম্ভব ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ততটা অগ্রগতি তখন হয়নি। তাঁদের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ছিল মূলত অনুমানভিত্তিক।

পরে ভিয়েনার লিওপোল্ড অয়েনব্রুগার (Leopold Auenbrugger—1722-1809 খৃঃ) রোগীর বুক পেট আঙ্গুল দিয়ে ঠুকে পারকাসন্ (Percussion) করে রোগী পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে জানা সম্ভব হোল ফুসফুসের ভিতরে হাওয়া বেশী আছে, না নেই; অথবা ফুসফুসের আচ্ছাদন প্লুরার গহবরের (Pleural sac) ভিতরে জলীয় পদার্থ জমেছে কিনা।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী চিকিৎসক থিওফিল রেণে লেনেক (Theophile Laennec-1781-1826 খৃঃ) স্টেথোস্কোপ বা শ্রুতিযন্ত্র

আবিষ্কার করলেন। এর দ্বারা ফুসফুসের ভিতরে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ আছে কিনা, অথবা শ্বাসনলীর ভিতরে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ বেশী আছে কিনা, শ্বাসনলীর ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে জানা সম্ভব হোল।

এর পরে ধীরে ধীরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা দিকে যান্ত্রিক উন্নতি শুরু হয়ে যায়। গত শতকের একেবারে শেষদিকে (1895 খৃঃ) রঞ্জন রশ্মি দ্বারা ফুসফুস পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন জার্ম্মান পদার্থ বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম্‌ কনরাড ভন রনজেন (Wilhelm Konrad von Rontgen 1845-1923 খৃঃ)। যান্ত্রিক উপায়ে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নির্ণয় করার যন্ত্র আবিষ্কার হয় এই শতকে। ফুসফুস কত বাতাস নিতে পারছে আর কতটা বের করে দিতে পারছে, সেটা যন্ত্রের দ্বারা সঠিকভাবে মাপা সম্ভব হোল। এরপরে, কয়েক বছর আগে, রক্তে কতটা কার্বন-ডাই-অকসাইড আর কত অকসিজেন আছে তার পরিমাণও সঠিকভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসার ব্যাপারেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে। প্রথমদিকে কোন কোন গাছের পাতা বা শিকড় বেটে রস খাইয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা হয়েছে। এই সেদিনও ধুতুরা পাতা সিগারেট হিসাবে ব্যবহার করা হোত রোগ নিরাময়ের চেষ্টায়। তার পরে এই শতকের শেষার্ধে করটিসোন, ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট, স্যালবুটামল ও টারবুটালিন জাতীয় ওষুধ পাওয়ার ফলে হাঁপানির চিকিৎসা অনেক সহজ হয়েছে।

বহু বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাবিভাগে উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানি রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন এসেছে। আজ সময় মত সঠিক চিকিৎসা দ্বারা বহু হাঁপানি রোগীর রোগ নিরাময় সম্ভব। যেখানে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় নি, সেখানে রোগীর কষ্ট লাঘব করে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া গিয়েছে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়না, কারণ হয়ত প্রথমদিকে চিকিৎসায় অবহেলা হয়েছিল অথবা চিকিৎসা আরম্ভ করতে দেরী হওয়ার জন্য বুকের খাঁচায় (Thoracic cage) বা ফুসফুসে, এমফাইসিমা (Emphysema) ধরণের এমন স্থায়ী পরিবর্তন হয়েছে যেখান থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব।

# প্রথম পর্ব

**শ্বাসনলী ও ফ্রুসফ্রুসের ( Respiratory Airway and Lung ) গঠন ও ক্রিয়াকলাপ এবং হাঁপানি রোগে তার কি পরিবর্তন হয় ঃ**

শ্বাসযন্ত্রের প্রধান কাজ হোল পালমোনারী ধমনী বাহিত যে রক্ত ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাসের (Alveolus) চারপাশে কৌশিক জালিকায় ( Capillary ) প্রবাহিত হয়, তার ভিতর থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ পৃথক করে অ্যালভিওলাই-এর মধ্যে গ্রহণ করা এবং অ্যালভিওলাই-'এর বিশুদ্ধ বাতাস থেকে আহৃত অক্সিজেন গ্যাস কৌশিক জালিকায় পেঁছে দেওয়া। কৌশিকজালিকা থেকে সেই রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে যায় পালমোনারী শিরা বেয়ে। বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত যায় বাম ভেনট্রিক্‌লে এবং সেখান থেকে দেহের প্রধান ধমনী অ্যায়োর্টার মাধ্যমে সারা দেহের সব ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তবাহিত অক্সিজেন
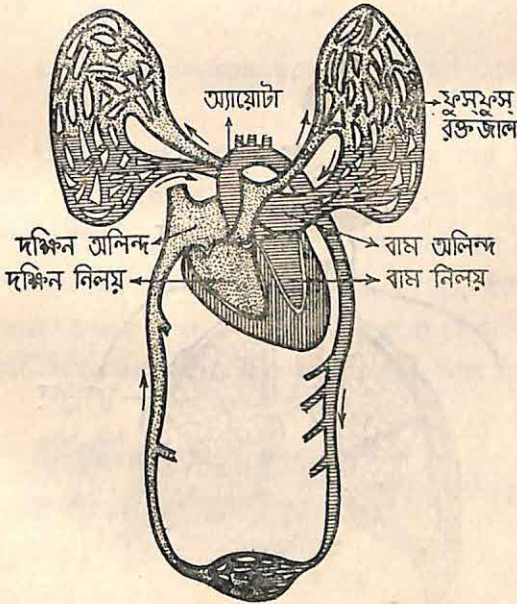
চিত্র—1

শরীরের বিভিন্ন কোষ ও টিস্যুতে সরবরাহ হয় এবং তাদের কাছ থেকে কার্বন-ডাই-অকসাইড নিয়ে রক্তস্রোত ফিরে আসে ডান অ্যাট্রিয়ামে। সেখান থেকে ডান ভেনট্রিকল্ দ্বারা চালিত হয়ে আবার ফিরে যায় ফুসফুসের কৌশিক জালিকায়। রক্ত এইভাবে সব সময়েই আবর্তিত হচ্ছে এবং ফুসফুসও সর্বদাই রক্তের কার্বন-ডাই-অকসাইড নিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ করছে ( চিত্র-1 )।

শ্বাস যন্ত্রের শুরু নাক থেকে এবং শেষ হচ্ছে ফুসফুসে মৌচাকের মত কোষ অ্যালভিওলাস-এ ( ছবি-2 ক ও 2 খ )।

আমরা যখন শ্বাস নিই তখন বাতাসের সঙ্গে ধূলিকণা, বীজাণু ইত্যাদি অবাঞ্ছিত পদার্থ শ্বাস পথে প্রবেশ করে। নাকের ভিতরের ছোট ছোট লোম এবং শ্লেষ্মার আস্তরণে যে চটচটে আঠাল পদার্থ থাকে তারা বেশীর ভাগ দূষিত পদার্থকে আটক করে এবং পরে এগুলি কফের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

এ ছাড়া, আমরা শ্বাসক্রিয়ার সময়ে যে বাতাস টেনে নিই, তাতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে না। নাকের ভিতরে জলীয় পদার্থ বাতাসকে একটু আর্দ্র

চিত্র—2 ক

অতি ক্ষুদ্র শ্বাসনলী
বায়ুথলী
বায়ুথলীর একটি অংশ বিবর্দ্ধিত অবস্থায়
রক্ত জালিকা
বায়ুথলী
রক্ত জালিকা

চিত্র—2 খ
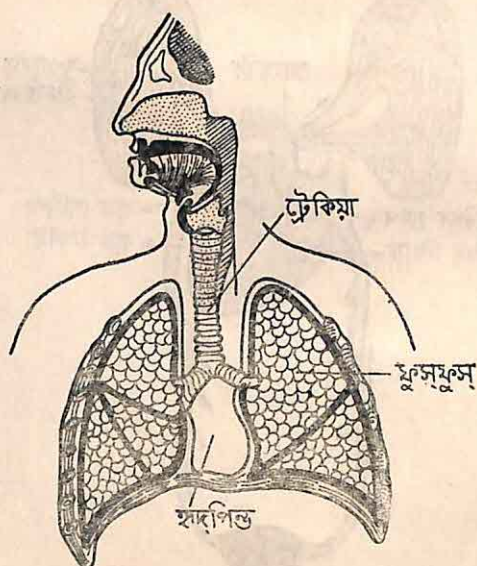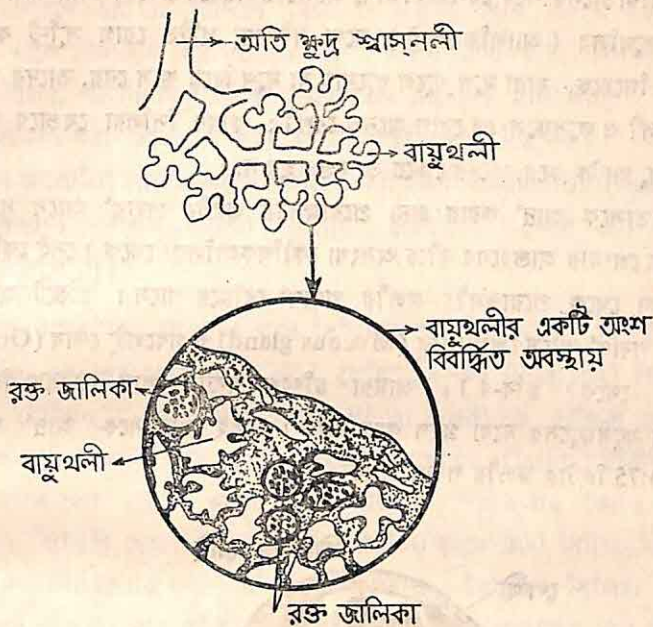
করে নেয়। বাতাস বেশী শুকনো হলে শ্বাসযন্ত্র ভালভাবে কাজ করতে পারে না।

বাইরের বাতাসকে শরীরের প্রয়োজন মত গরম করে দেওয়াও শ্লেষ্মা ঝিল্লীর কাজ। নাকের ভিতরে, ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাস দুটির ভিতরে এবং প্রায় গোটা শ্বাসনলীর মধ্যেই খুব ছোট ছোট রোঁয়া আছে, যার নাম সিলিয়া (**Cilia**) (ছবি-3)। সিলিয়াদের কাজ হোল ধূলিকণা, বীজাণু ইত্যাদি বহিরাগত পদার্থকে আটকে দেওয়া। বাতাস যদি বেশী শুকনো হয় বা বেশী ঠাণ্ডা হয়, তখন সিলিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আর সিলিয়া ঠিকমত কাজ না

চিত্র—3

করলে বাতাসের সঙ্গে যেসব বীজাণু আমাদের শরীরে ঢোকে, তারা শ্বাসনালী বা বায়ুথলির (অ্যালভিওলাই) মধ্যে বীজাণু ঘটিত রোগ সৃষ্টি করে। দেখা গিয়েছে, যারা মুখ খুলে ঘুমোয় বা মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, তাদের মধ্যে শ্বাসনলী ও ফুসফুস-এর রোগ অনেক বেশী; কারণ সিলিয়া যেভাবে রোগ বীজাণু আটক করে, এদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

বাতাসকে আর্দ্র করার জন্য প্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ আসে নাকের ভিতরে শ্লেষ্মার আস্তরণের নীচে অসংখ্য কৌশিকজালিকা থেকে। সেই কৌশিক জালিকা থেকে প্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে। চটচটে আঠাল জলীয় পদার্থ আসে শ্লেষ্মাগ্রন্থি (Mucous gland) ও গবলেট্ কোষ (Goblet cells) থেকে (ছবি-4)। আমরা চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় 10,000 লিটার বাতাস ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করে থাকি। সেই বাতাসকে আর্দ্র করার জন্য 0·75 লিটার জলীয় পদার্থ দরকার [2]
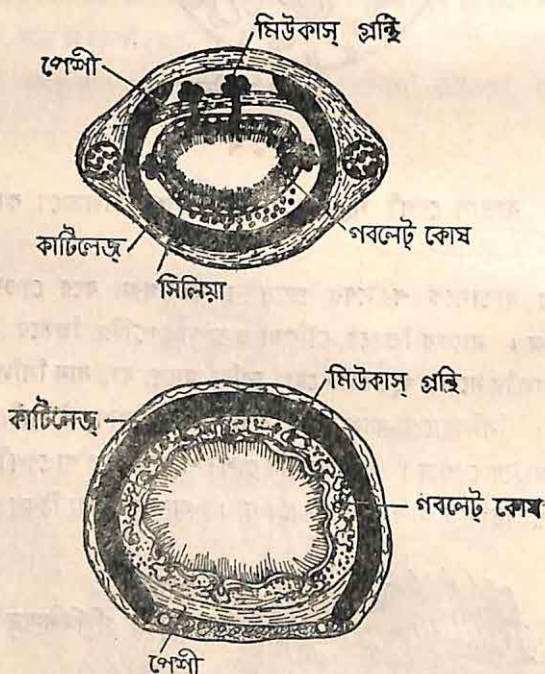
চিত্র—4

ট্রেকিয়া (নীচে) ও ব্রংকাই (উপরে) অনুপ্রস্থছেদ—Transverse section

শ্বাসপথে শ্লেষ্মার আস্তরণ থেকে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, তার মধ্যে থাকে সায়ালিক অ্যাসিড, নিউট্রাল পলিস্যাকারাইড্‌স্‌, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, পটাসিয়াম ও কয়েকপ্রকার রোগ নিরোধক অ্যানটিবডি ( কঙ্কাল ও ভাইরাল অ্যানটিজেন ও অ্যানটিবডি, লাইসোজাইম ইত্যাদি )। এ ছাড়া যাদের অ্যালার্জি আছে, তাদের শরীরে রিয়াজিনিক অ্যানটিবডিও (Reaginic antibody) পাওয়া যায়। হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ(3)।

শ্বাসপথের মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র সিলিয়ার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সেগুলি নাসাগহ্বরের সামনের অংশ, ফেরিংক্‌স্‌-এর (Pharynx) পিছনের অংশ, ল্যারিংক্‌স্‌-এর দুটি স্বরযন্ত্র (Vocal cord) ও ট্রেকিয়া যেখানে দুভাগ হয়ে ব্রংকাই তৈরী হয়েছে সেখানকার কেরিনা (Carina) ছাড়া বাকী সব অংশে দেখা যায়। শ্বাসপথের শ্লেষ্মাঝিল্লী কলাম্‌নার কোষে ঢাকা থাকে। প্রতিটি কোষের উপর দিকে প্রায় 170 থেকে 200 সিলিয়া সাজান থাকে। এরা লম্বায় 6-7 $\mu$m। দেখা গিয়েছে, ইদুঁরের সিলিয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 21 বার কাঁপে(4)। শ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের সঙ্গে যে-সব অবাঞ্ছিত পদার্থ শ্বাসপথে প্রবেশ করে, এই সিলিয়াগুলি তা ঝাঁট দিয়ে বার করে দেয়।

কিন্তু বিরূপ পরিবেশে সিলিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না—যেমন, (1) বাতাস যদি শুকনো হয়, (2) শ্বাসপথে যদি বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা তৈরী হয়, (3) যদি সিলিয়া লম্বায় ছোট হয় ( যারা ধূমপায়ী তাদের সিলিয়া আকারে ছোট হয়(5a) এবং কোথাও হয়ত একেবারে ঝরে যায়(5b)। (4) যাঁরা সুরাপায়ী তাঁদের সিলিয়া ভালভাবে কাজ করতে পারে না, (5) কয়েক-প্রকার ওষুধ, যেমন অ্যাট্রোপিন, কোকেন প্রভৃতি সিলিয়ার কাজ ব্যাহত করে। স্বভাবতই যে-সব লোকের সিলিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করে না তাদের মধ্যে শ্বাসনলীর রোগ বেশী হতে দেখা যায়(5c)।

ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাস ও ব্রঙ্কিয়োল চিত্র—5 ( ক্ষুদ্রতম ক্লোমশাখা )—শ্বাসপথের এই অংশ ত্রিস্তরে গঠিত ( চিত্র—4 )। স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

(1) শ্লেষ্মার আস্তরণ—যা সিলিয়াযুক্ত কলামনার কোষ দিয়ে ঢাকা থাকে ;

চিত্র—5
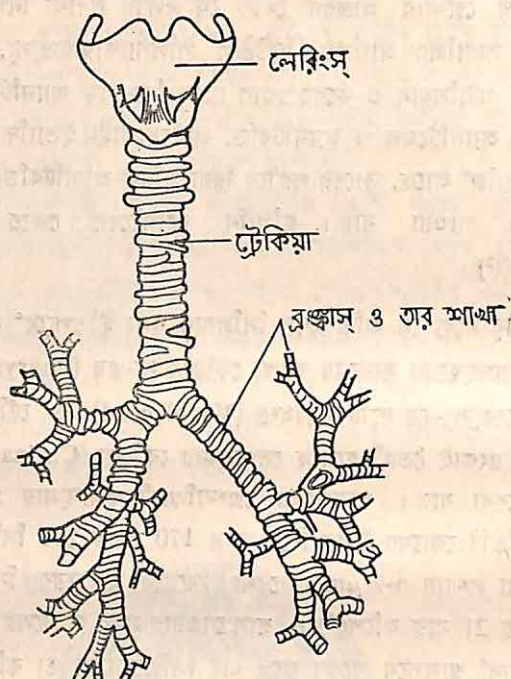
(2) শ্লেষ্মার আস্তরণের ঠিক নিচের স্তর বা বেসমেন্ট্ আস্তরণ ;

(3) তন্তু ও তরুণাস্থি জাতীয় টিস্যু (**Fibro-cartilaginus**) এবং পেশীর আস্তরণ।

(1) শ্লেষ্মার আস্তরণ—ছদ্ম স্ট্রাটিফায়েড কলাম্নার কোষ স্তর, তার ওপরে সাজান আছে সিলিয়া ; মধ্যে মধ্যে আছে গবলেট্ কোষ। এই কোষ থেকে শ্বাসপথে কিছুটা জলীয় পদার্থ সরবরাহ হয়। শ্লেষ্মার আস্তরণে প্রচুর শিরা, ধমনী ও কৌশিকজালিকা আছে—সেখান থেকেও দরকার মত জলীয় পদার্থ আসে। ব্রংকাস যত দূরে যায়, তার ব্যাস ততই সরু হতে থাকে এবং গবলেট্ কোষগুলি সংখ্যায় কমতে থাকে।

(2) বেসমেন্ট আচ্ছাদন ; শ্লেষ্মা ঝিল্লীর ঠিক নীচেই থাকে সূক্ষ্ম তন্তু জালের একটি স্তর এবং তন্তুজালের মাঝে মাঝে অবস্থান করে

লিমফোসাইট (Lymphocyte) ও মাস্‌ট্‌ কোষ (Mast cells)। মাস্‌ট্‌ কোষ নিঃসৃত হিস্‌টামিন জাতীয় পদার্থ হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগ বৃদ্ধির কারণ। এই আস্তরণের ঠিক নীচেই আছে শ্লেষ্মা কোষ। এই কোষগুলি শ্বাসপথের জন্য প্রয়োজনীয় শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে; চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় 100 মিলিলিটার শ্লেষ্মা তৈরী হয়। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে বা কোন রোগাক্রমণের ফলে প্রদাহ হলে অনেক বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়ে থাকে। ফলে সিলিয়াগুলি ঠিক মত কাজ করতে পারে না বলে এই শ্রেণীর লোকদের শ্বাসনলীর রোগ বেশী হতে দেখা যায়।

(3) ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাস ও ব্রঙ্কিয়োলের পেশী স্তর ঃ ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাসের পেশী সংকোচন হলে তাদের ভিতরের পরিধি কমে যায় এবং শ্বাসনলীর ব্যাস সরু হয়ে যায়। ট্রেকিয়া ও বড় ব্রঙ্কাসে পেশী আছে শুধু পিছনের দেয়ালে। সেই পেশী ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাসের অর্ধচন্দ্রাকৃতি তরুণাস্থির দুই প্রান্তে আবদ্ধ। পেশীর সংকোচন হলে শ্বাসনলীর পরিধি সরু হয়ে যায়; ফলে ভিতরের শ্লেষ্মার আস্তরণ কিছুটা ভাঁজ হয়ে ভিতরে ঢুকে যায় এবং তার পরিণতি

চিত্র—6
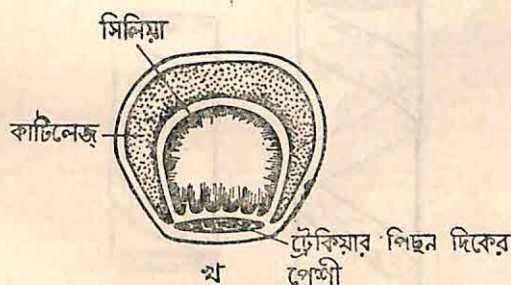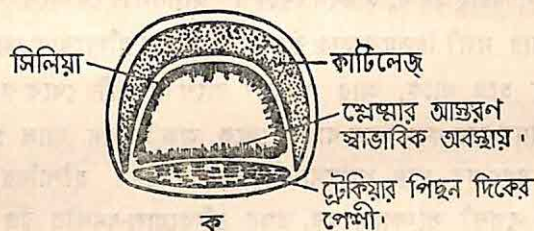
পেশী সংকোচনের ফলে শ্লেষ্মার আস্তরণ ভাঁজ হয়ে যায়।

হিসাবে শ্বাসনলীর ব্যাস আরও কমে গিয়ে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয় ( চিত্র ৬ ক ও খ )

মধ্যম আকৃতির ব্রঙ্কাসের পেশী পুরোপুরি বৃত্তাকারে অবস্থিত। এক্ষেত্রেও পেশী সঙ্কোচন হলে শ্বাসনলী সরু হয়ে যায় এবং ভিতরে শ্লেষ্মার আস্তরণ ভাঁজ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্বাসনলীর পরিধি আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

আরও দূরের ব্রঙ্কাসে গোলাকার পেশী ছাড়াও কিছু পেঁচাল পেশী **(Spiral fibres)** থাকে যেগুলি ব্রঙ্কাসের গা জড়িয়ে ঘুরে ঘুরে আরও দূরে ব্রঙ্কিয়োলের দিকে অগ্রসর হয় ( চিত্র 7 ক )। একসঙ্গে এই উভয় প্রকার পেশীর সঙ্কোচন হলে ব্রঙ্কাস ও ব্রঙ্কিয়োলের শুধু পরিধিই কমে না, তারা দৈর্ঘ্যেও ছোট হয়ে যায় ( চিত্র 7-খ )। একাধারে পরিধি ও আকারে ছোট হওয়ার জন্য বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

**শ্বাসনলী ও ফুসফুসের রক্ত সরবরাহ ঃ**

এই রক্ত সরবরাহ হয় দুটি উৎস থেকে। শ্বাসনলীর যে অংশ শুধু বায়ু যাওয়া আসার নলী হিসাবে কাজ করে, সেই অংশে ব্রঙ্কিয়োল ধমনী মারফৎ রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে, আর পরবর্তী অংশ যা শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের করে দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে, সেই অংশ সরবরাহ পায় পালমোনারী ধমনী থেকে। হাঁপানির সময় যখন ব্রঙ্কিয়োলের পেশী সঙ্কোচন হয়, তখন ব্রঙ্কিয়োল-ধমনীর রক্ত তার উচ্চ

চিত্র—7
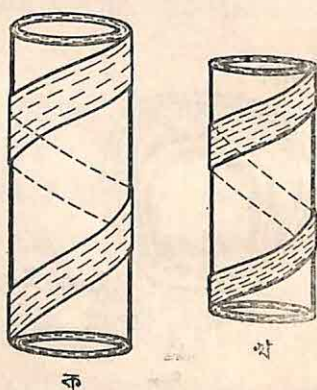
চাপের জন্য শ্লেষ্মাঝিল্লির নীচে কৌশিক জালিকায় পৌঁছোতে পারে, কিন্তু পেশী সঙ্কোচনের ফলে কৌশিক জালিকায় অবরোধ সৃষ্টি হয় বলে সেই রক্ত পালমোনারী শিরাতে যেতে পারে না ; ফলে শ্লেষ্মার আস্তরণটি ফুলে ওঠে এবং শ্বাস- প্রশ্বাসের পথে আরও বেশী বিঘ্ন ঘটে।

---

# দ্বিতীয় পর্ব

হাঁপানি রোগ বলতে আমরা বুঝি শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি। এই শ্বাসকষ্ট কিছু সময় বা কয়েক ঘণ্টা পরে যখন উপশম হয়, তখন রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু কোন কোন লোকের হাঁপানি প্রক্রিয়া সব সময়ে কম বেশী চলতেই থাকে এবং মাঝে মাঝে যখন শ্বাস পথে কোন কারণে আরও বেশী বাধা সৃষ্টি হয়, তখন রোগী হাঁপানির জন্য কষ্ট অনুভব করেন।

**(A) হাঁপানি রোগে কেন শ্বাস কষ্ট হয় ঃ**

শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস চলাচল পথের ব্যাসে সামান্য পরিবর্তন হলেও আমাদের শ্বাসকার্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে ঃ

(1) ব্রঙ্কিয়োলের পেশী সঙ্কোচন—যার ফলে শ্বাসনলীর ব্যাসের পরিবর্তন হয় ; গোলাকার পেশী (circular fibres) সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে শ্বাসনলী সরু হয়ে যায় এবং পেঁচান পেশী (Spiral fibres) সঙ্কোচনের জন্য শ্বাসনলীর দৈর্ঘ্য কমে যায় ( চিত্র 7 খ )

(2) যখন সরু বা মাঝারি আকারের ব্রঙ্কাসের মধ্যে কঠিন শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ জমে এবং সেই শ্লেষ্মা অপসারণে যদি বাধা সৃষ্টি হয়, শ্বাসপথে আংশিক অবরোধ ঘটে।

(3) শ্বাসনলীর ভিতরের শ্লেষ্মা ঝিল্লী যখন প্রদাহ কিংবা এ্যালার্জি জনিত কারণে ফুলে ওঠে তাতেও শ্বাসনলীর ব্যাস কমে যায়।

অথবা উপরোক্ত তিনটি কারণের মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্বাসপথে স্বাভাবিক বায়ুচলাচল ব্যাহত হয়ে থাকে। এই তিনটি কারণের মধ্যে প্রথমটি এক শ্রেণীর রোগীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ; এঁদের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং কিছু পরে চিকিৎসার ফলে, এমন কি অনেক সময় বিনা চিকিৎসাতেও রোগী সুস্থ বোধ করেন।

### (B) হাঁপানি রোগের প্রকোপ হার ঃ

হাঁপানি খুবই সাধারণ রোগ। আনুমানিক হিসাবে জনসংখ্যার শতকরা একজন হাঁপানিতে আক্রান্ত। এই রোগের ক্ষেত্রে বয়স ভেদে স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত 15 বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের প্রথম আক্রমণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে প্রভেদটি লক্ষণীয়। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শতকরা 90 জন পুরুষের হাঁপানির প্রথম আক্রমণ হয়েছে 35 বছর বয়সের আগে, এবং তার মধ্যে শতকরা 80 জন আক্রান্ত হয়েছিলেন 15 বছর বয়সের মধ্যে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে 15 বছর বয়সে আক্রান্ত হয়েছেন শতকরা মাত্র 40 জন; আর 35 বছর বয়সের ভিতরে শতকরা 75 জন। অপরদিকে 35 বছর বয়সের পরে শতকরা 25 জন নারী এবং শতকরা 10 জন পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন (6)।

যাদের অল্প বয়সে হাঁপানি শুরু হয়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে রোগের ঘন ঘন আক্রমণ ও তীব্রতা কিছু কম হতে দেখা যায়। সম্ভবত বয়স বেড়ে যাওয়ায় শ্বাসনলীর ব্যাস কিছুটা বাড়ে এবং বায়ু চলাচলের বাধাও হ্রাস পায়। দেখা গিয়েছে, শৈশবে যাদের হাঁপানি শুরু হয়, সাত বছর বয়সের পরে রোগের তীব্রতা কিছু কমে যায় (6)।

আমাদের দেশে প্যাটেল চেস্ট্ ইন্সটিটিউটে 1840 জন রোগীর এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন 1038 এবং নারী 802 জন। আনুপাতিক বয়স ও রোগের প্রকোপ হার নিম্নরূপ ঃ (7)

বৎসর হিসাবে—

| বয়স | 0—14 | 15—24 | 25—34 | 35—44 | 45—54 | 55— |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শতকরা হার | 12·55 | 17·8 | 27·45 | 22·8 | 12·4 | 6·46 |

রোগের প্রথম প্রকাশ—

| বয়স | 0—14 | 15—34 | 35—54 | 55 ও তদূর্ধ্বে |
|---|---|---|---|---|
| শতকরা হার | 23·2 | 53·8 | 20·6 | 2·44 |

এই সমীক্ষায় আরও জানা গিয়েছিল যে উচ্চ আয়ের পরিবারের শিশুদের মধ্যে হাঁপানি রোগের প্রকোপ একটু বেশী (8)।

**(C) হাঁপানি রোগ বেশী দেখা যায় কাদের ঃ**

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে হাঁপানি রোগীদের ব্রংকাস সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় কিছুটা অতিসংবেদনশীল (**Hypersensitive**) (৭)। বিশেষ ধরণের উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে এলে এদের দেহে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যার কিছুটা সুনির্দিষ্ট (**Specific**), কিছু অনির্দিষ্ট (**Non-specific**)। হাঁপানি যাদের হয়নি এমন সুস্থ মানুষ ঐ একই উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে এলে কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে হাঁপানি রোগীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ;

1. বহির্জাত (**Extrinsic**)—যে ক্ষেত্রে বাহিরের কোন অ্যালার্জেন হাঁপানি সৃষ্টি করেছে এবং তা প্রমাণ করা সম্ভব।

2. অন্তর্জাত (**Intrinsic**)—আপাতদৃষ্টিতে যেখানে বাইরের কোন অ্যালার্জেন হাঁপানি সৃষ্টি করে না, তবে সেরকম কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

এই মতবাদের ভিত্তিতে উপরিউক্ত দুই ধরনের হাঁপানির মধ্যে একটা পার্থক্য রেখা টানা যেতে পারে ; যেমন—

| বহির্জাত | অন্তর্জাত |
| --- | --- |
| 1. সিরামে ইমুনোগ্লোবিউলিন 'ই' (**IgE**) বেশী থাকে। | 1. ইমুনোগ্লোবিউলিন 'ই' কম বা স্বাভাবিক। |
| 2. অল্প বয়সীদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। | 2. সাধারণত দেখা যায় প্রাপ্ত বয়স্ক বা মধ্যবয়সীদের মধ্যে। |
| 3. হঠাৎ আক্রমণ হয় এবং রোগ লক্ষণের উপশমও হয় হঠাৎ। | 3. রোগ দীর্ঘস্থায়ী ও পুরাতন এবং একটানা থাকে—পূর্ণ উপশম হয় না। |
| 4. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অ্যালার্জির ইতিহাস থাকে। | 4. ব্যক্তিগত বা বংশগত অ্যালার্জির ইতিহাস কমই পাওয়া যায়। |

**বহির্জাত হাঁপানির প্রকৃতি ঃ** এই রোগীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন অ্যালার্জেন শরীরে প্রবেশ করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদের সিরামে ইমুনোগ্লোবিউলিন—ই (IgE) বেশী পরিমাণে থাকে। সামান্য

একটু অ্যালার্জেন সূচ দিয়ে ত্বকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে বা শুঁকতে দিলে শ্বাসনলীতে তাৎক্ষনিক টাইপ—1 (Type-1) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে (10)।

অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে থাকলে যাদের বহির্জাত হাঁপানি আছে, তাদের সিরামে ইমুনোগ্লোবিউলিন-ই আরও বেড়ে যায়। চিকিৎসা করার সময় যখন কমমাত্রায় অ্যালার্জেন প্রয়োগ দ্বারা সংবেদনশীলতা কমিয়ে (Hyposensitization) আনার চেষ্টা করা হয়, তখনও প্রথমদিকে সিরামে ইমুনোগ্লোবিউলিন-ই বেড়ে যায়; চিকিৎসা চালিয়ে গেলে পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বহির্জাত হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট (Disodium Chromoglycate) একটি কার্যকরী ওষুধ।

কোন কোন বহির্জাত হাঁপানি রোগীর টাইপ-1 প্রতিক্রিয়ার বদলে টাইপ-3 প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে এদের ক্ষেত্রে হাঁপানির সূত্রপাত হয় টাইপ—1 প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। টাইপ-3 প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় কিছু পরে; তিন-চার ঘন্টা পরে যখন টাইপ-1 প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটে, টাইপ-3 প্রতিক্রিয়া তখনো চলতে থাকে বলে রোগ উপশম হয় না। এই শ্রেণীর রোগীদের ক্ষেত্রে ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট্ সুফল দেয় না; তবে কর্টিসোন প্রয়োগে ভাল কাজ হয়। (10a) ও (10b)

**অন্তর্জাত হাঁপানির প্রকৃতি**ঃ এই শ্রেণীর রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাধির সূত্রপাত হয় শ্বাসপথে বীজাণু বা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে। তাছাড়া আবহাওয়ার তাপের গুরুতর তারতম্য এবং বাতাস বাহিত দূষিত পদার্থ শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই রোগীদের রক্তে আই-জি-ই (IgE) কখনও বেশী থাকলেও সিরামে তা দেখা যায় না, কারণ আই-জি-ই (IgE) রক্তে প্রবহমান শ্বেতকণিকার গায়ে লেগে থাকে (11)।

এইসব তথ্য জানা সত্ত্বেও একটি প্রশ্নের কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যায় না। সেটি হোল, একই অ্যালার্জেন বা বীজাণু যখন বহুলোকের শ্বাসপথে প্রবেশ করে তখন একজনের হাঁপানি হয়, অন্যদের হয় না কেন! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা বিজ্ঞানীরা করেছেন বিটা অ্যাড্রিনারজিক তথ্যের (Beta-Adrenergic theory) সাহায্যে (12)। এই মতবাদ প্রবক্তাদের অভিমত হোল এই যে মানুষের ব্রঙ্কাস 'ক্যাটিকল অ্যামাইন-এর (Catecholamine)

প্রভাবাধীন। আমাদের শরীরে যে 'আলফা' ও 'বিটা' শ্রেণীর রিসেপ্টর যা গ্রাহক (receptor) আছে, তার মধ্যে 'আল্ফা রিসেপ্টর' ব্রঙকাসের-শ্বাসনলীর সঙ্কোচন ঘটায় এবং 'বিটা রিসেপ্টর' তাদের পেশী শিথিল করে শ্বাসনলীর ব্যাস বৃদ্ধি করে। এই দুই শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ ব্রঙকাসের পেশীর সমতা রক্ষা করে থাকে; নর-অ্যাড্রিনালিন (Nor-Adrenaline) আল্ফা রিসেপটরের উপর কাজ করে; আইসো-প্রেণালিন Iso-Prenalin) কাজ করে বিটা রিসেপ্টরের উপর এবং অ্যাড্রিনালিন দুই প্রকার রিসেপটরের উপরেই কাজ করে।

বিটা রিসেপটর সম্ভবতঃ একপ্রকার এনজাইম (Enzyme) অ্যাডেনিল সাইক্লেজ (Adenyl Cyclase), যা নিজের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না করে অ্যাডিনোসিন-3′ 5′ মনোফসফেট (Adenosine 3′ 5′ monophosphate) তৈরী করতে সাহায্য করে। এই অ্যাডিনোসিন-3′ 5′ মনোফসফেট বা সাইক্লিক-এ-এম-পি (Cyclic A.M.P.) কোষের মধ্যে ক্যাটিকল-অ্যামাইন-এর কাজে সহায়তা করে ব্রঙকাসগুলির পেশী শিথিল করে। কিন্তু সাইক্লিক এ-এম-পি খুব তাড়াতাড়ি অপর এক এনজাইম ফসফোডাই-এসটারেজ (Phospho di-estarase) দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় (চিত্র-৪)। অ্যামাইনোফাইলিন (Aminophyline) জাতীয় ওষুধ ফসফোডাই-এসটারেজের কাজ প্রতিরোধ
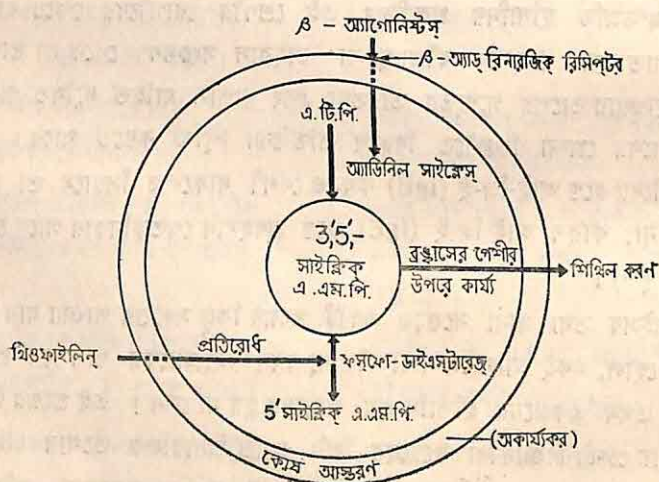
চিত্র—৪

করতে পারে ; তার ফলে সাইক্লিক এ-এম-পি'র ভেঙ্গে যেতে দেরী হয় এবং ঐ সাইক্লিক এ-এম-পি বেশী সময় কাজ করতে পারে (13) ।

এই তথ্য ভিত্তি করে অনুমান করা হয়, যাঁদের হাঁপানি আছে তাঁদের অ্যাডেনিল সাইক্লেজ এনজাইম কম থাকে বলে সাইক্লিক এ-এম-পি তৈরী হয় কম পরিমাণে। ফলে আলফা-বিটা রিসেপ্টরের সমতা নষ্ট হয়। আলফা রিসেপ্টর বেশী শক্তিতে কাজ করে. শ্বাসনলীর পেশী সংকোচন হয় এবং তার ব্যাস কমে গিয়ে বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে (11) ।

**(D) কি প্রকার উত্তেজক (stimuli) দ্বারা হাঁপানির আক্রমণ হয় ঃ**

হাঁপানির আক্রমণ নানাভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে আরম্ভ হতে পারে। এমন দেখা গিয়েছে যে আপাত সুস্থ কোন লোক যার শরীরে হাঁপানির কোন লক্ষণ অন্য সময়ে দেখা যায় না, কোন এক অতি সাধারণ উত্তেজক তার শরীরে ভীষণ হাঁপানি সৃষ্টি করেছে। অপর এক শ্রেণীর রোগী আছে যাদের সব সময় কম-বেশী শ্বাসকষ্ট থাকে এবং এই ধরণের সাধারণ উত্তেজক তাঁদের শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

শ্রেণী বিভাগ ঃ যে সব উত্তেজক (Stimuli) হাঁপানি জনিত শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি করে সেগুলিকে আমরা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন,—

1. অ্যালার্জেন
2. বীজাণু ও ভাইরাস
3. মনোবিকার বা মানসিক রোগ
4. অতি পরিশ্রম, ব্যায়াম ও অবসাদ
5. দূষিত বাতাস
6. অন্যান্য কারণ ঘটিত উত্তেজনা – যেমন আবহাওয়া, কড়াগন্ধ, অজীর্ণ ইত্যাদি।

চিত্র – 9 ক
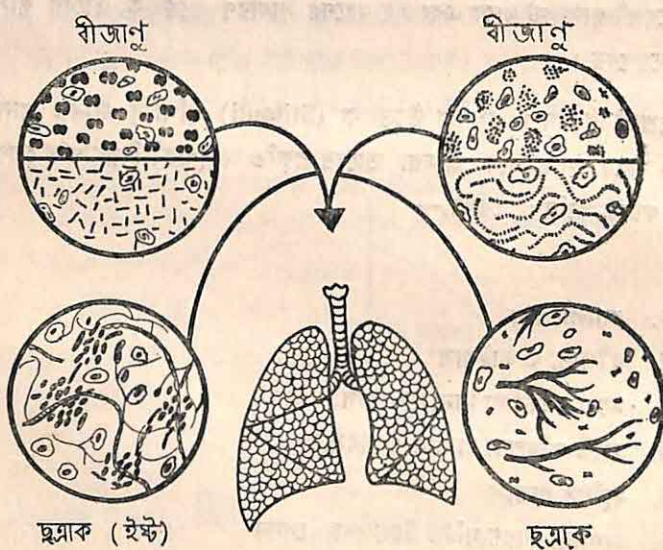
চিত্র—9 খ

এ ছাড়া বহুরোগীর ক্ষেত্রে বংশগত হাঁপানি, এক্‌জিমা, আমবাত বা নাকে অ্যালার্জি'র ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে।

অ্যালার্জেন জনিত হাঁপানি সাধারণতঃ বহির্জাত হাঁপানিতে আক্রান্তদের মধ্যেই দেখা যায়, এই ধরনের হাঁপানি শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লীর অতিসংবেদনশীলতার জন্য হতে পারে। শ্লেষ্মা ঝিল্লীর উত্তেজনা ঘটতে পারে নানাভাবে, নানা দিক থেকে—যেমন, পরাগরেণু, নানাজাতের ছত্রাক ও ছাতা পড়া জিনিষ, ঘরের ভিতরের ধূলিকণা, কয়েক প্রকার খাবার, পোকা-মাকড়ের হুলের বিষ বা তাদের শরীরের কোন অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে জল হাওয়ার বেশী তারতম্য ঘটলে হাঁপানির আক্রমণ হতে দেখা গিয়েছে।

1. (a) **পরাগ রেণু** থেকে হাঁপানি বা 'হে-ফিভার' যে হতে পারে এই তথ্য স্বীকৃতি পেয়েছে 1920 খ্রীষ্টাব্দে। তবে তার আগেও এই সন্দেহের কথা বিভিন্ন চিকিৎসক নানাভাবে বলেছিলেন। 1831 খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে ডাঃ জন ইলিয়টসন তাঁর এক রোগীর কাছে জেনেছিলেন যে এক প্রকার ঘাসের ফুলের পরাগ রেণু নাকে গেলেই তাঁর হাঁচি হয়, জ্বর আসে। পরে বাক্‌'ম্যান নামে এক জার্মান চিকিৎসক ঘাসের ফুলের পরাগরেণু নিজের নাকে ঘষে দেখেছিলেন তাঁর তৎক্ষণাৎ 'হে ফিভারের' লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই কথা তিনি ডাঃ ফিলিপ ফোবাসকে বলেছিলেন। পরে 1861 খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ফোবাস এক মনোগ্রাফে এই তথ্য প্রকাশ করেন। এই মনোগ্রাফ প্রকাশের
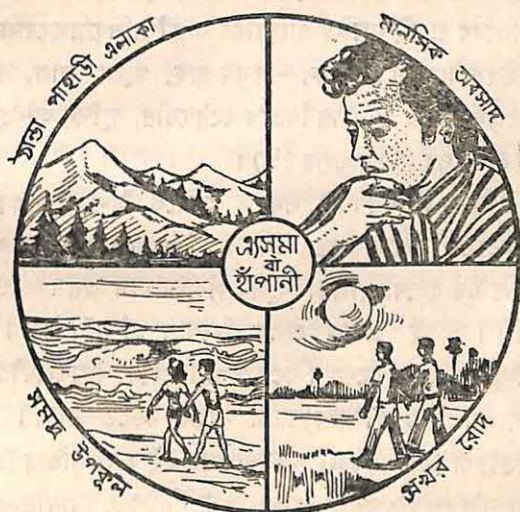
চিত্র—9 গ

দুবছর আগে ( 1859 খ্রীষ্টাব্দে ) ম্যানচেস্টারে ডাঃ চার্লস হ্যারিসন ব্লাকলে অসাবধানে ফুলদানীতে ঘাসের ফুল নাড়াচাড়া করতে গিয়ে নিজেই 'হে ফিভারে' আক্রান্ত হন। বহু বছর গবেষণার পরে পরাগ রেণু থেকে যে এ্যালার্জি জাতীয় রোগ হতে পারে, বিজ্ঞানীরা সে-সম্পর্কে একমত হওয়ার ফলে এই তথ্য আজ বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত (14)।

সব জাতের পরাগ রেণুতে এ্যালার্জি বা হাঁপানি দেখা দেয় না। সেই রেণুতে এ্যালার্জি সৃষ্টি করার উপাদান থাকা চাই। তা ছাড়া রেণু খুব হালকা হওয়া চাই, যা বাতাস সহজে বহন করতে পারে এবং পরিমাণেও যথেষ্ট থাকা দরকার, কারণ বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে যদি যথেষ্ট মাত্রায় শ্বাসপথে না যায়, তাহলে এ্যালার্জি বা হাঁপানি হবে না। বিভিন্ন হাঁপানি রোগীর বিশেষ বিশেষ রেণু দ্বারা হাঁপানির উদ্ভব হয়। যে পরাগরেণু একজনের হাঁপানি সৃষ্টি করে, তা অন্যের কোন ক্ষতি নাও করতে পারে।

আমাদের দেশে পরাগ রেণুর দ্বারা হাঁপানি বা এ্যালার্জি রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়নি। কেবল মাত্র দিল্লীর আশেপাশে শিবপুরী ও কর্ত্তার সিং বিভিন্ন শ্রেণীর রেণু নিয়ে গবেষণা করেছেন (15)। তাঁরা দেখেছেন, দিল্লীর বাতাসে সব সময়েই কমবেশী রেণু ভেসে বেড়ায়। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি এবং ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাতাসে রেণুর পরিমাণ খুব বেশী থাকে। ঐ সময়ে স্থানীয় লোকদের প্রায়ই নাকের এ্যালার্জি ও হাঁপানি রোগ দেখা যায়।

রেণুর উৎস নানা সূত্র থেকে,—যেমন গাছ, গুল্ম, ঘাস, ফুল ইত্যাদি। এছাড়া বাতাসে রেণুর পরিমাণ নির্ভর করে রৌদ্র, বৃষ্টি, আবহাওয়ার তাপের তারতম্য ও বাতাসের গতির ওপর (16)।

1 (b) ছত্রাক : বর্ষার সময় অনেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে অব্যবহৃত জুতো, ভিজে ছাতা, এমন কি ভিজে পোষাক ঠিক মত না শুকিয়ে ফেলে রাখলে এক ধরণের হালকা ধূসর সবুজ দাগ হয়। এটা হোল ছত্রাক ( Fungus )। এই ছত্রাক লোক বিশেষে হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। দিল্লীর কাছে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, বহু শ্রেণীর ছত্রাকের মধ্যে একুশটি এ্যালার্জি ও হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় 10,000 ত্বকের প্রতিক্রিয়া (Skin test) পরীক্ষা করে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে প্রধান পাঁচ শ্রেণীর ছত্রাক হোল-ফোমা, মিউকর, ক্যানডিডা, কুরভুলেরিয়া ও এসপারজিলাম টামারি (17)। এক হাজার উনষাটটি হাঁপানি ও এ্যালার্জি-

জনিত নাসিকা প্রদাহে (Rhinitis) আক্রান্ত রোগী পরীক্ষা করে শতকরা 59 জনের ত্বকে ছত্রাক জনিত প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে (18)।

ছত্রাক 20°—32° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ভালভাবে জন্মাতে পারে; অবশ্য ঠাণ্ডাতেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। ঘরে বাইরে যে কোন জায়গায় ছত্রাক সৃষ্টি হতে পারে। সকলেই জানেন, বর্ষাকালে ঘরে পাঁউরুটি পড়ে থাকলে তার উপরে ছত্রাক জন্মায়। অপরদিকে আমরা দেখেছি ঘরের ভিতরে আসবাব, কার্পেট, ঘরের কোণে জমা করা ময়লা কাপড় ইত্যাদিতে ভাল ভাবেই ছত্রাক জন্মায়। বাড়ীর বাইরে বাগানের বা ছাদের টবে গাছের জন্য যে জৈবসার ব্যবহৃত হয় তাতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নানা জাতের ছত্রাক পাওয়া যায়। পথে পড়ে থাকা গোবরে বাতাসে উড়ে আসা ছত্রাক বাসা বাঁধে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। গ্রামে গোয়াল-ঘরের পাশে সারগাদা ছত্রাক সৃষ্টির খুব ভাল পরিবেশ। অনেক সময় বাগানের গাছে বা ফুলে ছত্রাকের আক্রমণ হয়; সেই ফুল ফুলদানীতে রাখলে মানুষের দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

পাঁউরুটি ছাড়া আরও অনেক খাবারের উপর ছত্রাক সৃষ্টি হতে পারে, যেমন – বাসি রুটি, পুরোন কেক, কাটা আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি। বর্ষায় এই জাতীয় খাবারের ওপর ছাতা পড়ার কথা প্রায় সকলেরই জানা আছে।

(c) **ঘরের ভিতরের ধূলিকণা ঃ** সিনেমার পর্দায় যখন আলো পড়ে, তখন অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখায় দেখা যায় সূক্ষ্ম কিছু কণা উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই রকম অন্ধকার ঘরে দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে সরু রেখার মত সূর্যরশ্মি যখন ঘরে ঢোকে, তার মধ্যে লক্ষ্য করলে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা উড়তে দেখা যায়। ঘরের ভিতরের এইসব ধূলিকণা কিন্তু বাইরের ধূলিকণা থেকে আলাদা। ঘরের ভিতরের কণা সৃষ্টি হয় গৃহে যাঁরা বাস করেন তাঁদের দেহের চামড়ার উপরের আস্তরণ, আসবাব, বিছানা-বালিশের ধুলো, গৃহপালিত কুকুর-বিড়াল-পাখীর লোম বা শুকনো মলের কণা, ইঁদুর-ছুঁচো-আরশুলা ইত্যাদির মল বা তাদের লোম বা চামড়ার অংশ থেকে অথবা বাসি বা ফেলে দেওয়া খাবারের উপর যে ছত্রাক জন্মায় এবং সেগুলি যখন বাতাসে ওড়ে তা থেকে। অবশ্য বাইরে থেকে পরাগ রেণু বা ছত্রাক কণা উড়ে এসে এদের সঙ্গে মিশতে পারে। বিছানা, কার্পেট ইত্যাদি যখন নাড়া হয় তখন এই জাতীয় ধূলিকণা খুব বেশী মাত্রায় উড়তে থাকে। বাড়ী বা পাঠাগারে বই-এর আলমারী যখন পরিষ্কার করা হয়, তখন এই জাতীয় ধূলিকণা খুব বেশী পরিমাণে উড়তে দেখা যায়।

বাড়ীর ধূলিকণা নাকে ঢুকলে হাঁপানি হয়, অথচ রাস্তার ধূলিকণা ঝড়ের সময় বাতাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শ্বাসপথে প্রবেশ করলেও হাঁপানি হয় না এমন ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখি। ঘরের ধূলিকণার মধ্যে কি এমন বিশেষ জিনিষ থাকে যা আমাদের হাঁপানি সৃষ্টি করে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে এক ডাচ চিকিৎসা গবেষক সংস্থার গবেষণার ফলে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে আমাদের বাসগৃহের মধ্যে একজাতীয় সাধারণ 'মাইট' (mite) জাতীয় জীবাণু দেখা যায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ডারমাটোফ্যাগয়েডস্ টেরোনিসিনাস (Dermatophagoides pteronyssinus)। এরা ঘরের ধূলিকণার সঙ্গে মিশে থাকে। কোন প্রকারে শ্বাসপথ এই 'মাইট' মিশ্রিত ধূলিকণার সংস্পর্শে এলে শরীরে এ্যালার্জি জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; তার ফলে হাঁচি, নাক দিয়ে প্রচুর জল পড়া বা হাঁপানি রোগ হতে পারে ([19])। পরে আরও গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে মোটামুটি তিন প্রকার 'মাইট' মানুষের শরীরে এ্যালার্জি জনিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে; তারা হোল ডি-ফারিনি, ডি-টেরিনিসিনাস ও ই-মেনাই। এরা মানুষের শরীরের চামড়া থেকে ঝরে যাওয়া মামড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। এই মামড়ি বিছানার চাদর, বালিশ, তোয়ালে-গামছা ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষ 24 ঘন্টায় 0 7 গ্রাম থেকে 1·4 গ্রাম মামড়ি ত্যাগ করে। এই মাইট আর্দ্র আবহাওয়া, 25 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে ভালভাবেই বাড়তে পারে ([20])।

মাইটের বিস্তৃতি সারা বিশ্বে। ঘরের ধূলিকণা থেকে অ্যান্টিজেন তৈরী করে এক সমীক্ষা হয়েছিল। ধূলিকণা অ্যাণ্টিজেন (1 : 1000) ও ডি-ফারিনি নির্যাস থেকে তৈরী অ্যান্টিজেন (1 : 19,000) চামড়ায় ফুটিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছিল। এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন 46 জন হাঁপানি রোগী ও 32 জন সুস্থ লোক। পজিটিভ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল শতকরা 67 ও 70 জন হাঁপানি রোগীর উপর যথাক্রমে ঘরের ধূলিকণা ও মাইট অ্যাণ্টিজেন ব্যবহার করে। অপর দিকে সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা 32 ও 36 ([21])।

1 (d) খাদ্য

খাদ্য থেকে যে এ্যালার্জি ও হাঁপানি হয় এই তথ্য বহুকাল আগে থেকে জানা ছিল। হিপোক্রেটিস (খৃীঃ পূঃ 460-370) দুধ খাওয়ার পরে আন্ত্রিক গোলমাল এবং গায়ের স্থানে স্থানে ফুলে ওঠা ও চুলকানি হওয়ার কথা

লিখেছিলেন। গ্যালেন (129- 99 খৃঃ) তাঁর এক রোগীর ছাগলের দুধ খেয়ে এ্যালার্জি জাতীয় প্রতিক্রিয়ায় হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। গত শতাব্দীতে 18 9 খৃষ্টাব্দে সল্টার হাঁপানির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে খাদ্য থেকেও যে হাঁপানি হতে পারে তা আমাদের জানিয়েছেন।

কি কি খাদ্য থেকে এ্যালার্জি বা হাঁপানি হতে পারে তার তালিকা হবে অতি দীর্ঘ। ডিম, কাঁকড়া বা চিংড়িমাছ থেকে এ্যালার্জি বা হাঁপানি হতে পারে, এ তথ্য বহুল প্রচারিত। কিন্তু ঐ তিনটি ছাড়া আরও বহু খাদ্যকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে ; যথা—কয়েক প্রকার ডাল, গমের তৈরী খাদ্য, চাল, কলা, লেবু, আপেল, কাজুবাদাম, চীনাবাদাম, আঙ্গুর, তরমুজ, শশা, মূলো, সজিনা ডাঁটা, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন, সরিষা, ওলকপি, চকোলেট, কয়েকপ্রকার গুড়, মধু, দুধ ও দুধ থেকে তৈরী খাবার, ইত্যাদি।

কিন্তু কেবল মাত্র খাবারের জন্য এ্যালার্জি ও হাঁপানি রোগীর সংখ্যা খুবই কম। তবে শিশুদের মধ্যে খাদ্য থেকে এ্যালার্জি ও হাঁপানি বেশী হতে দেখা যায় ([22])। চোবটু ও তাঁর সহযোগীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বয়স্কদের মধ্যে শুধু খাদ্যের জন্য হাঁপানি হতে দেখা গিয়েছে শতকরা মাত্র 0·25% জনের ; অপরদিকে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার শতকরা 15% ([23])।

### 1(e) আবহাওয়ার গুরুতর তারতম্য :

ঠাণ্ডাবাতাস লাগলে কোন কোন লোকের হঠাৎ পরপর কয়েকটা হাঁচি হয়, নাক দিয়ে জল পড়ে, আবার কখনও কখনও শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়। এ ধরণের অভিজ্ঞতা নিজেদের জানা আছে বা পরিচিত লোকের হতে দেখা গিয়েছে। ঠাণ্ডাজল খেয়ে বা হঠাৎ ঠাণ্ডাজলে স্নান করে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি হওয়া বিচিত্র নয়। ঠাণ্ডা লেগে মুখের ভিতরের শ্লেষ্মা ঝিল্লি ও শ্বাসরন্ধ্র (Glottis) ফুলে উঠে এই প্রকার উপসর্গ সৃষ্টি করে ([24])।

অপরদিকে বেশী গরম হাওয়া, সূর্যতাপ বা বেশী গরমজলে স্নান, গরম আবহাওয়ায় বেশী পরিশ্রম চামড়া ও শরীরের উপর নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাঁপানির আক্রমণ সূচনা করে ([25])।

### 1(f) পতঙ্গ জনিত এ্যালার্জি :

কোন পোকা বা পতঙ্গ কামড়ালে আমরা ব্যাথা পাই এবং সেই কামড়ানোর জায়গা ফুলে ওঠে। প্রায় সব প্রকার পতঙ্গের হুলে বিষ থাকে, তা কোন

ক্ষেত্রে বেশী আবার কোথাও বা খুবই কম। কোন কোন পতঙ্গের বিষে হিস্টামিন, কাইনিন, অ্যাসিটিল কোলিন এবং 5-এইচ-টি (5HT) জাতীয় পদার্থ থাকে, যা মানুষের শরীরে এ্যালার্জি জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রকার অ্যালার্জেনের দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে হাঁপানি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পতঙ্গের বিষ শরীরে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে এবং পরে সেই জাতীয় পতঙ্গের বিষ শরীরে পুনঃপ্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে ভীষণ আকার ধারণ করে এবং ফলে কখনও কখনও প্রাণ সংশয় হয় ([26])।

কামড়ান ছাড়া অন্য ভাবেও পতঙ্গজনিত এ্যালার্জি হতে পারে। পতঙ্গের জীবন খুব স্বল্পস্থায়ী। তারা মরে গেলে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে গিয়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যায়। সেই ধূলিকণা ঝড় বা জোরাল বাতাসে উড়ে কোন সংবেদনশীল লোকের নাকে প্রবেশ করলে নাকের এ্যালার্জি বা হাঁপানি হতে পরে ([27])।

হাঁপানি বা এ্যালার্জি জনিত রোগে যারা ভুগছে তাদের নিয়ে এক প্রয়োগ সমীক্ষায় পতঙ্গ থেকে তৈরী অ্যাণ্টিজেন প্রয়োগ করে দেখা গেল শতকরা 34·9 জনের ক্ষেত্রে ধনাত্মক (Positive) প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আর কণ্ট্রোল হিসাবে যে সব সুস্থ লোকের উপর ঐ একই অ্যাণ্টিজেন প্রয়োগ করা হল তাদের মধ্যে ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল শতকরা মাত্র 4·5 জনের ([28])।

যে-সব পতঙ্গ থেকে মানুষের হাঁপানি হতে পারে তাদের সংখ্যা ও শ্রেণীতালিকা খুবই দীর্ঘ। আমাদের ঘরের সাধারণ আরশুলা থেকে মাঠের ফড়িং, প্রজাপতি, মথ্, পঙ্গপাল এমন কি মশা পর্য্যন্ত এই তালিকায় আসতে পারে। বিদেশের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব শিশু হাঁপানিতে ভোগে তাদের মধ্যে শতকরা 38 জনের আরশুলায় এ্যালার্জি আছে ([29])। কীট-পতঙ্গ ছাড়া গৃহপালিত পশু-পাখীর লোম বা তাদের শুকনো বিষ্ঠা ধুলোর সঙ্গে মিশে শ্বাসপথে গিয়ে হাঁপানি সৃষ্টি করতে পারে।

### 1 (g) ঔষধ জনিত এ্যালার্জি ঃ

কয়েকধরনের রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধের জন্য শরীরে সিরাম ইনজেক্সন দেওয়া হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে এর ফলে মারাত্মক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়, যাকে বলা হয় অ্যানাফিল্যাক্সিস (Anaphylaxis)। এটি টাইপ 1 শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া। এর ফলে কোন

কোন সময় মৃত্যুও হতে পারে। প্রতিক্রিয়া মৃদু হলে শরীরের এখানে ওখানে ফুলে ওঠে, চোখের পাতা খুব বেশী ফুলে ওঠে। গলার ভিতরে শ্বাসরন্ধ্র ( Glottis ) ও সরু শ্বাসনলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লী ফুলে উঠে শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে।

সিরাম ছাড়া আরও অনেক ওষুধ যেমন ঘুমের ওষুধ বারবিচুরেট, সালফোনামাইড, কুইনিন ([30]), এমনকি সাধারণ মাথা ধরার ওষুধ অ্যাসপিরিন ([31]) ইত্যাদি খাওয়ার পরে যাদের এ্যালার্জি বা হাঁপানি প্রবণতা আছে, তাঁদের রক্তে প্রোটিনের সঙ্গে মিশে এক ধরনের অ্যান্টিজেন তৈরী করে। সেই রোগী পরবর্ত্তী সময়ে আবার যখন ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন তখন তাঁর শরীরে তীব্র অথবা মৃদু এ্যালার্জি অথবা হাঁপানি রোগের উদ্ভব হয়।

আজকাল আমরা নানা অ্যান্টিবায়োটিক ও কেমোথেরাপিউটিক ওষুধ ব্যবহার করে থাকি, যেগুলি থেকে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন রকম এ্যালার্জি ঘটিত প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যাচ্ছে। হরেকরকম প্রোটিনযুক্ত ওষুধ, ওরিস শিকড় ( যা মুখে মাখার পাউডার তৈরী করতে ব্যবহার হয় ), কাঠ চেরাই করে যে গুঁড়ো পাওয়া যায়, ([32]) ময়লা পরিষ্কার করা পাউডার ( Deterg nt Powder ), প্লাটিনামের লবণ ([33]) ( Platinum Salt ) রাসায়নিক কারখানার আইসোসায়ানেট ( Isocyanates ) ([34]) ইত্যাদি এ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে।

বস্তিবাসী শিশুদের মধ্যে একধরণের হাঁপানি দেখা যায় যার উৎপত্তি অ্যাসকেরিস ( Ascaris ) জাতীয় কৃমি থেকে ([35])। দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের বাসস্থানের পরিবেশ অনেকসময় অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে। সেই সব অপরিচ্ছন্ন ও স্যাঁতসেঁতে ঘরে ব্যাসিডোস্পোর ([36]) ও আরশুলা ([37]) থাকতে পারে এবং তার সংস্পর্শে এসে এ্যালার্জিপ্রবণ লোকের হাঁপানি হতে পারে।

পিয়ারসন 375 জন রোগীর উপর গবেষণামূলক পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে হাঁপানি সবচেয়ে বেশী হয় ঘরের মধ্যের ধুলো থেকে— শতকরা প্রায় 45-60 জনের। এই সমীক্ষায় সব বয়সের রোগীদের নেওয়া হয়েছিল। এর পরেই এ্যালার্জি জনিত হাঁপানির দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসাবে স্থান পেয়েছে পরাগ রেণু, পশু-পাখীর লোম বা ডানার অংশ ইত্যাদি ([38])।

2. শ্বাসপথে বীজাণু ও ভাইরাস আক্রমণ ঃ

আগেই বলা হয়েছে, শ্বাসনলীতে কোন প্রদাহ হলে তার শ্লেষ্মা ঝিল্লী ফুলে ওঠে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়। এই প্রদাহজনিত হাঁপানি শৈশবেই বেশী দেখা যায়। মধ্য বয়সেও শ্বাসনলী প্রদাহের ফলে হাঁপানি হতে পারে, কিন্তু সেটা আনুপাতিক হারে নারীদের মধ্যে বেশী (39)।

বীজাণু সংক্রমণ হলে কম-বেশী প্রদাহ সকলেরই হয়, শ্বাসকষ্টও প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়—তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু হাঁপানি রোগীদের বেলায়-শ্বাসকষ্ট অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। সুতরাং হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে বীজাণু সংক্রমণ জনিত প্রদাহ ছাড়া অন্য কারণ থাকা সম্ভব।

অনুমান করা হয়েছে যে প্রদাহ যেখানে আরম্ভ হয় সেখানে কোষ সমষ্টির মধ্যে আক্রমণকারী বীজাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্টিবডি বা প্রতিরোধক পদার্থ জমতে থাকে। পরে সেই বীজাণু যখন আবার আক্রমণ করে তখন বীজাণু দেহের অ্যান্টিজেন এবং শ্বাস পথে জমে থাকা অ্যান্টিবডির মিলিত প্রতিক্রিয়ার শ্বাসপথের শ্লেষ্মাঝিল্লী অনেক বেশী ফুলে ওঠে এবং বায়ু চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যদি ঐ একই জাতীয় বীজাণু একজন সুস্থ লোককে আক্রমণ করত, তার হয়ত সামান্য ধরনের ব্রংকাইটিস-এর মত অসুস্থতা হোত (40) কিন্তু যাদের হাঁপানি-প্রবণতা থাকে, তাদের-শ্বাসপথে বারবার বীজাণু আক্রমণের ফলে শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এই ধরণের হাঁপানিকে এ্যালার্জি ও বীজাণু সংক্রমণের মিলিত ফল বলা যেতে পারে। বীজাণু আক্রমণের পরে যে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেটিও একপ্রকার এ্যালার্জি। আমেরিকাতে সুইনফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা একশ প্রদাহজনিত হাঁপানি রোগীর মধ্যে এক সমীক্ষায় দেখেছেন যে তাদের মধ্যে ৪৪ জনের অন্যান্য এ্যালার্জি জনিত কারণ আছে (41)। তাঁরা ম্যাকজিলারি সাইনাস ও শ্বাসপথের নীচের অংশে বীজাণু জনিত প্রদাহ বেশী দেখেছিলেন। ক্রফটন ও ডগলাসের অভিজ্ঞতায় অন্যান্য কারণের চেয়ে এ্যালার্জি জনিত, হাঁপানি রোগীর সংখ্যা বেশী (42)।

3. মনোরোগ ঃ

অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, যে-সব বালক-বালিকা হাঁপানিতে ভোগে, তারা সামান্য মানসিক আঘাতেই আহত হয়; অথবা নিজেরা কোন

নির্দোষ বা তুচ্ছ ঘটনার মনগড়া অর্থ করে অনর্থক কষ্ট পায়। অনেক চিকিৎসক, যাঁদের হাঁপানি আছে নিজেরা পরিণত বয়সে এই তথ্য সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এই সব চিকিৎসকের একজন ছিলেন গত শতকে ফরাসী দেশের খ্যাতনামা মেডিসিনের অধ্যাপক ট্রুসো। তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে হাঁপানি বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময়ে বলেছিলেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে তীব্র হাঁপানি হয়েছিল যেদিন আমি শুনলাম আমার ঘোড়ার গাড়ীর সহিস আমাকে ঠকিয়েছে। সহিস ওটের ( oat ) প্রকৃত ওজন গোপনকরে আমাকে কম হিসেব দিয়েছে। আমি তখন রোগী দেখে ফিরছি, সমস্ত পথ মনের মধ্যে গুমরে মরছিলাম। বাড়ী ফিরেই খুব তাড়াতাড়ি সোজা চলে গেলাম চিলে কোঠার ঘরে। সহিসকে বললাম ওট ওজন করতে। সে বস্তা থেকে ওট ঢেলে ফেলতেই ধুলো উড়তে লাগল, নাকেও ঢুকল। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমার গলা চেপে ধরেছে; আমি গলার টাই আলগা করে জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলাম। কিছু সময় পরে হাঁপানির তীব্রতা কমে গেল।" তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত করেছেন, বিশ্বাসী লোকের বিশ্বাসভঙ্গ করা, না থেমে উপরে ওঠার পরিশ্রম এবং সেই সঙ্গে ওটের ধুলো শ্বাসপথে যাওয়া, এই তিনের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সেই দিনের হাঁপানি এত তীব্র হয়েছিল (43)।

শিশু ও বালক বালিকাদের মধ্যে যারা হাঁপানিতে ভোগে তাদের মধ্যে মানসিক রোগ প্রবণতা সেই বয়সের অন্য বালক-বালিকাদের চেয়ে বেশী। বৃটেনের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়েছে (44)। অবশ্য এই ধরনের অসুখে তাদের বুদ্ধিমত্তার কোন অবনতি ঘটায় না; এমনকি তারা সমবয়সী বালক-বালিকাদের সমান বুদ্ধিমান (45) অথবা কিছু বেশী বুদ্ধিমান (44)।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একটি মানসিক আঘাতের পরেই হাঁপানির আক্রমণ শুরু হয়েছে। রিজ আটশ রোগীর হাঁপানি আক্রমণের পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহ করে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে শতকরা 35 জন হাঁপানি আক্রমণের আগে মানসিক চাপে ভুগেছে অথবা আঘাত পেয়েছে (45)।

স্মিথ ও তাঁর সহযোগীরা দেখেছেন যে সম্মোহন করে যদি ভয়, রাগ বা হাঁপানি আক্রমণের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তাহলে শ্বাসনলীতে বায়ু চলাচলে আংশিক অবরোধ ঘটে (46)।

মনের অবস্থার সঙ্গে হাঁপানি রোগের সম্পর্ক যে কত গভীর হতে পারে, কয়েকটি ঘটনার উদাহরণে তা বোঝান যেতে পারে। কোন লোকের হয়ত

গোলাপফুল শোঁকার পরে হাঁপানির একটা আক্রমণ হয়েছিল। এ থেকে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে গোলাপ ফুল শুঁকলে তার হাঁপানি হবে। আবছা অন্ধকারে সেই লোকের নাকের কাছে প্লাসটিক-এর গোলাপ ধরে হাঁপানি হতে দেখা গিয়েছে। একটু শিক্ষিত লোক যার অ্যালার্জেন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে, তার নাকে যদি সাধারণ নরম্যাল স্যালাইন অ্যাটমাইজার ছিটিয়ে বলা হয় যে এই জলে অ্যালার্জেন আছে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাঁপানি আক্রমণ হবে ([47])। এক রাত্রে কোন একজন অধ্যাপকের হাঁপানির আক্রমণ হওয়াতে তিনি মনে করেন, জানলা বন্ধ, ঘর গুমোট হয়েছে, সেইজন্য হাঁপানি হয়েছে। তিনি নিজে জানালার কাঠের পাল্লা খুলে দিলেন এবং কিছু সময় পরে হাঁপানি উপশম হতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে তিনি দেখলেন, জানলার কাঠের পাল্লা খোলা হলেও কাঁচের পাল্লাটি বন্ধ ছিল। এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে।

4. **পরিশ্রম ও ব্যায়াম ঃ**

যাঁরা সবসময়েই কম-বেশী হাঁপানিতে ভোগেন তাঁরা অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যাদের মাঝে মাঝে হাঁপানি হয়, তবে আপাতসুস্থ, তাঁরা আটমিনিটের মত পরিশ্রম করার পরে তাদের এফ-ই-ভি ( Forced Expiratory Volume, অর্থাৎ সজোরে শ্বাস ছাড়লে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের পরিমাণ ) কমতে আরম্ভ হয় এবং প্রায় পনের মিনিট পরিশ্রমের পরে সব চেয়ে কম হতে দেয়া যায় ([48]) ([49])। দৌড়ানোর পরেই পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া হয় সব চেয়ে বেশী ; সাইকেল চালনায় প্রতিক্রিয়া কিছু কম এবং সাঁতারে সব চেয়ে কম ([50])। কি কারণে প্রতিক্রিয়ার এই তারতম্য, তা ঠিক জানা নেই। তবে দেখা গিয়েছে ইচ্ছাকৃত গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার পরে ( Hyperventilation ) এফ-ই-ভি (F. E. V.) কমে যায় ([51])। কিন্তু পরিশ্রমের আগে যদি ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ( Di-Sodium Chromoglycate ) ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে পরিশ্রম জনিত প্রতিক্রিয়া কমান সম্ভব হতে পারে, এমন কি নাও হতে পারে ([52])। আমি আমার হাঁপানি রোগীদের, সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে, ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ব্যবহার করতে উপদেশ দিই এবং বেশীর ভাগ রোগীকে এর দ্বারা উপকৃত হতে দেখেছি।

### 5. দূষিত বাতাস ঃ

যাদের হাঁপানি আছে তাঁরা বাতাসে ধোঁয়া মোটেই সহ্য করতে পারেন না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাঁপানি রোগীরা ধূমপায়ীদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলেন। কুয়াশার সময় হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্ট আরও বেড়ে যায়, কারণ শীতে বাতাস ভারী হওয়ার ফলে কলকারখানা ও গৃহস্থদের রান্নাঘরের ধোঁয়া উপরে উঠতে পারে না।

### 6. অন্যান্য কারণ ঃ

নাকে পলিপ ( Polyp ) বা দুই নাসারন্ধ্রের অন্তবর্তী দেয়াল ( Septum ) বাঁকা থাকলে, নাকের পাশের ম্যাকজিলারী সাইনাসে ( Maxillary Sinus ) বীজাণু সংক্রমণ হলে কোন কোন লোকের হাঁপানি হতে দেখা যায়। পলিপ অপারেশন করার পরে হাঁপানি সেরে যেতে দেখা গিয়েছে ; কেন ঠিক জানা নেই ; হয়ত কাকতালীয় হতে পারে। তেমনি সেপ্টামের দোষ এবং সাইনাসের রোগ সেরে যাওয়ার পরে অনেক ক্ষেত্রে হাঁপানি রোগ সেরে যেতে দেখা যায়।

এ ছাড়া ঘরের নতুন রংএর গন্ধ, কড়া সেন্ট-এর গন্ধ, ল্যাবরেটারীর গ্যাসের গন্ধ হাঁপানি-প্রবণ ব্যক্তিদের রোগ সূচনা করতে পারে (53)।

তবে সাধারণত একটি মাত্র কারণে হাঁপানির আক্রমণ হয় না। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে একাধিক কারণ মিলিতভাবে হাঁপানি সৃষ্টি করে। উইলিয়ামস্ ও তাঁর সহকর্মীরা 487 জন রোগীর হাঁপানির কারণ অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শ্বাস পথে বীজাণু আক্রমণের জন্য শতকরা 44 জনের, মানসিক অসুস্থতার জন্য শতকরা 70 জনের এবং এ্যালার্জি জনিত কারণে শতকরা 64 জনের হাঁপানি হয়েছে। এ ছাড়া উপরের তিনটি কারণ শতকরা 38 জন রোগীর ক্ষেত্রে মিলিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল (54)।

---

# তৃতীয় পর্ব

**বিকারগত বৈশিষ্ট্য ( Pathological features )**

সাধারণ হাঁপানিতে মৃত্যু হয় খুব কম সেই জন্য হাঁপানি রোগের প্রথম অবস্থায় শ্বাসনলী ও ফুসফুসে কি ধরনের পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে শ্বাসনলীর পেশী সংকোচন ও দৈর্ঘ্য হ্রাস এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লী ফুলে ওঠার ব্যাপারে কোন রকম দ্বিমত নেই। এই পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক; যখনই হাঁপানির আক্রমণ প্রশমিত হয়, শ্বাসপথ ও ফুসফুস পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

সেইজন্য হাঁপানিরোগে ফুসফুস ও শ্বাসনলীতে যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই, সেগুলি বহু বছর রোগ ভোগ করার পরিণতি। এ ছাড়া মারাত্মক উপসর্গ স্ট্যাটাস অ্যাজম্যাটিকাস ( নিরবিচ্ছিন্ন তীব্র হাঁপানি ) রোগে যদি কোন রোগীর মৃত্যু হয়, শবব্যবচ্ছেদে পরিবর্তনগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যে রোগী বহুদিন হাঁপানিতে ভুগেছে, অন্য কোনও কারণে তার মৃত্যু হলে এই সুযোগ মিলতে পারে।

হাঁপানি রোগে ভুগলে কারও কারও ফুসফুসের আকার বড় দেখায়। বড় আকারের ব্রঙ্কাই ও ছোট ব্রঙ্কিয়োল ( 0·2-1 সেন্টিমিটার ব্যাস )-এর মধ্যে আঠার মত হলুদ বা ফিকে সবুজ রঙের শ্লেষ্মা জমে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বায়ুথলির কোষের মধ্যেও শ্লেষ্মা জমে থাকতে দেখা যায় [55]। অন্যথায় বায়ুথলির কোষগুলি আকারে বড় হয়, ফুসফুস দেখতে হয় হাল্কা গোলাপী, কেটে ফেলার পরে চুপসে যায় না এবং টুকরো করে জলে ফেলে দিলে ভাসতে থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, ছোট বড় সব শ্বাসনলী শ্লেষ্মা দিয়ে বন্ধ। কোষ ও টিস্যু বিশ্লেষণী ( Histological ) পরীক্ষায় ঐ শ্লেষ্মার মধ্যে ইয়োসিনোফিল কোষ ( Eosinophil cells ) ও 'শারকট্—লিডেন কেলাস' ( Chacot-Leyden Crystals ) লক্ষ্য করা যেতে পারে [56a] ও [56b]

সরু ব্রঙ্কাস ফুলে উঠে পুরু হতে দেখা যায়। এর শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মধ্যে ইয়োসিনোফিল ও প্লাজমা কোষ পাওয়া যায়। এই পুরু হওয়ার অন্যতম

কারণ বেসমেন্ট আস্তরণ ( Basement membrane ) মোটা হয়ে যাওয়া এবং ব্রংকাসগুলির পেশী পুরু হওয়া ; এ ছাড়া গবলেট কোষ ( Goblet cell ) ও শ্লেষ্মা গ্রন্থি ( Mucous gland ) আকারে বড় হয়। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে গবলেট কোষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় ([57])। অন্যান্য গবেষকদের মত কিন্তু ভিন্ন ; তাঁদের অভিমত অনুসারে গবলেট কোষ বাড়ে ক্রনিক ব্রংকাইটিসে। সাধারণ হাঁপানি রোগে গবলেট কোষ আকারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সংখ্যায় বাড়ে না ([58a])। অপর দিকে ব্রংকাসের পেশী যে মোটা দেখায়, তার কারণ একদিকে পেশীর আয়তন বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যারও আধিক্য। ব্রঙ্কাসের পেশীর নিউক্লিয়াস ( Nucleus ) গণনা করলে জানা যায় কত বেশী সংখ্যায় বেড়েছে ([58b])। গবেষণা করে দেখা গিয়েছে সুস্থ লোকের চেয়ে হাঁপানি রোগীদের পেশী তিনগুণ বেড়ে যেতে পারে ([58])।

স্টাটাস অ্যাজমাটিকাসে বা অবিরাম তীব্র হাঁপানিতে যে সব রোগীর মৃত্যু হয়, তাদের ব্রঙ্কাসে মাস্ট্ কোষের মধ্যে দানা ( Granules ) দেখা যায় না অথবা কম দেখা যায়। সম্ভবত মাস্ট্ কোষ থেকে দানা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এই পরিবর্তন ঘটে। দানা না থাকার জন্য অনেক সময় মাস্ট্ কোষ চেনা যায় না। সাধারণ হাঁপানী রোগী যাদের অন্য কারণে মৃত্যু ঘটে তাদের ক্ষেত্রে মাস্ট্ কোষের মধ্যে দানা থাকে ([59])।

সাধারণ হাঁপানি রোগীদের বায়ুথলির কোষে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে যে-সব বহু পুরাতন রোগীর ফুসফুসে এমফিসিমার উদ্ভব হয়, কোন কোন সময় তাদের বায়ুথলির কোষ ফেটে গিয়ে স্বতোৎসারিত নিউমোথোরাক্স্ ( Spontaneous pneumothorax ) হতে পারে। এ ছাড়া শতকরা 25 ভাগ রোগীর ব্রঙ্কাসে পরিবর্তন হয়ে ব্রঙ্কিয়াক্টেসিস সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তন ঘটে সাধারণত ফুসফুসের উপর অংশে অথবা সামনের দিকে।

---

# চতুর্থ পর্ব

( লক্ষণ ও নিদর্শন Symptoms and Clinical manifestations. )

হাঁপানি রোগ তিন প্রকারে প্রকাশ হতে পারে।

1. আপাতসুস্থ লোকের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল; কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা পরে কষ্ট উপশম হয় এবং রোগী আবার নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ মনে করেন।

2. শ্বাসকষ্ট হঠাৎ আরম্ভ হয়ে আর কমে না; উপরন্তু বেড়ে যেতে থাকে। কোন ওষুধে হাঁপানি কমে না। যদি এই অবস্থা বারো ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয় সেই ধরনের হাঁপানিকে বলা হয় 'স্টাটাস্ অ্যাজম্যাটিকাস' বা অবিরাম তীব্র হাঁপানি।

3. এক শ্রেণীর রোগীদের শ্বাসপথে বাতাস চলাচলে সব সময়েই অল্পবাধা থাকে। বহুদিন এই অবস্থায় থাকার ফলে কষ্টের অনুভূতি কম হয় এবং রোগী অল্পকষ্ট উপেক্ষা করেন। কোন কারণে শ্বাসপথে বায়ু-চলাচলে আরও বাধার সৃষ্টি হলে তখনই হাঁপানির কষ্ট অনুভূত হয়।

বেশীর ভাগ হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট হঠাৎ আরম্ভ হয়; সঙ্গে থাকে শুকনো কাশি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সোঁ-সোঁ (Wheeze) শব্দ। অল্প পরে শ্বাসের কষ্ট আরও বেড়ে যায় এবং বুকের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হয়। প্রশ্বাসের সময় শ্বাসনলীর ব্যাস আরও সরু হয়ে যায় এবং সেই সরু নলীর মধ্যে বাতাস চলাচলের সময় বাঁশীর মত আওয়াজ শোনা যায়। এই ধরনের শ্বাসকষ্ট সাধারণত হয় রাত্রে এবং তখন রোগী উঠে বসে দুহাতে শক্ত করে খাটের ধার, চেয়ার বা অন্য কিছু ধরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। কাঁধের এবং শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিস্ট অন্যান্য পেশীগুলিকে শক্ত করার চেষ্টা করেন শ্বাস নেওয়ার জন্য। কেউবা একটু বেশী বাতাসের আশায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়। রাত্রের দিকে হাঁপানির আক্রমণ হওয়ার কারণ হিসাবে অনুমান করা হয়, যেহেতু রাত্রে কর্টিসোন নিঃসরণ কম হয় সম্ভবত সেইজন্যই রাত্রে হাঁপানির আক্রমণের সংখ্যা ও তীব্রতাও বেশী। কিন্তু এই অনুমান যে ভুল এক পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। হাঁপানি রোগীকে রাতের দিকে

কর্টিসোন ইনজেকশন দেওয়ার পরেও তার প্রশ্বাসের সর্বোচ্চ হার (Peak Expiratory Flow Rate)—P.E.F.R.) কম হতে দেখা গিয়েছে (৬০)। বিজ্ঞানীরা এখন অনুমান করেন যে ঘুমের সময় আঠার মত শক্ত শ্লেষ্মা ছোট ও মাঝারি আকারের শ্বাসনলীগুলি বন্ধ করে দেয় এবং তারই ফলে শ্বাসকার্য্য ব্যাহত হয় ও হাঁপানির সূত্রপাত হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের হাঁপানি নিজে থেকেই অথবা ওষুধের দ্বারা উপশম হয়। রোগী অনেকক্ষণ কাশতে থাকে, পরে হঠাৎ কিছুটা পাকানো শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তারপরে আরও কিছু কফ্ নির্গত হওয়ার পর রোগী একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মত ঘুমিয়ে পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হাঁপানির কষ্ট কমে না, ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'স্টাটাস অ্যাজমাটিকাস' বা অবিরাম তীব্র হাঁপানি। এই ধরণের হাঁপানি খুব মারাত্মক। প্রথম দিকে রোগী কাশে কিন্তু কফ বের হয় না। পরে রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, জোর করে কাশতে পারে না; কিছু খেতে পারে না, এমন কি প্রয়োজন মত জলীয় পদার্থ বা জলও নয়। যদি ঠিকমত চিকিৎসা দ্বারা এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন না হয়, রোগীর চেতনা লোপ পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়।

যাদের সারা বছর কম-বেশী হাঁপানি থাকে তাদের রোগের লক্ষণ কিন্তু ভিন্ন প্রকারের। সাধারণত এদের শ্বাসপথে বা ফুসফুসে বীজাণু বা ভাইরাস আক্রমণের ফলে প্রদাহ হয়, অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয় এবং শ্বাসপথের ভিতরে শ্লেষ্মা ঝিল্লি ফুলে ওঠে। সুতরাং রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট কমে না।

যে-সব রোগীর শরীরে প্রতিরোধ শক্তি কম এবং যাদের শ্বাসপথে খুব বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হচ্ছে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় একটা 'ঘড় ঘড়' (Stridor) আওয়াজ শোনা যায়। এইসব রোগী অনেক সময় দুর্বলতার জন্য নিজে থেকে কফ তুলে ফেলতে পারে না। এদের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করার জন্য যান্ত্রিক সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।

### কায়িক নিদর্শন

হাঁপানির তীব্র আক্রমণের সময় রোগী শুয়ে থাকতে পারে না। সামনে শক্ত কিছু থাকলে যেমন খাটের ধার, চেয়ারের পিছন দিক বা কোন উঁচু টেবিল

দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কাঁধের পেশীকে শক্ত করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায় রোগী সমস্ত পেশীকে ফুসফুস থেকে হাওয়া বার করার কাজে লাগায়। মুখের চেহারা উৎকন্ঠিত, চোখে ভীত চাউনি; কখনও কখনও কপালে ও শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। মুখ খুলে শ্বাস নিতে চেষ্টা করে, জিভ শুকনো, গলার শির ফুলে উঁচু হয়ে ওঠে। বুকের খাঁচা বিস্তৃত হয়ে থাকে, এমন ভাবে বিস্তৃত থাকে যে শ্বাস নেওয়ার সময় আর বড় হতে পারে না। শ্বাসকার্যের স্বাভাবিক পেশীগুলি ছাড়া অতিরিক্ত পেশীগুলিকে কাজ করতে দেখা যায়। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে মুখ, ঠোঁট বা জিভে নীল আভা (Cyanosis) দেখা যায়। রোগীকে তাঁর কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করলে একটানা উত্তর দিতে পারে না, থেমে থেমে কেটে কেটে কথা বলে। এ ছাড়া বেশীর ভাগ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাঁশীর মত 'সোঁ-সোঁ' (Wheeze) আওয়াজ শোনা যায়।

হাত দিয়ে বক্ষ পঞ্জরের বিস্তৃতি মাপলে দেখা যাবে, শ্বাসকার্যে তার স্বাভাবিক বিস্তৃতি বা সংকোচন নেই বললেই হয়। স্বরকম্পন ( Vocal fremitus ) খুব কম অনুভব করা যায়। কিন্তু নাড়ীর গতি খুব দ্রুত এবং গুরুতর ধরনের হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে 'স্ববিরোধী নাড়ী' ( Pulsus paradoxus ) অনুভব করা যায়। স্বাভাবিক লোকের শ্বাস নেওয়ার সময় রক্ত চাপ 5 মি, মি, কমে যায়; কিন্তু হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে 10 মি, মি, কম হতে দেখা যায়। বোধ হয় ফুসফুসে অতিরিক্ত হাওয়ার চাপ থাকার জন্য হৃৎপিণ্ড ঠিকমত রক্ত পূর্ণ হয় না এবং সেইজন্য হৃৎপিণ্ড থেকে যথাযথ পরিমাণে রক্ত নিষ্কাশিত হয় না (61)। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রেখে এপেক্স্-স্পন্দন ভাল ভাবে অনুভব করা যায় না।

বুকে আঙ্গুল রেখে অপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঠুকলে (Percussion) ফুসফুসের অস্বাভাবিক উচ্চ অনুরণন ( Hyper resonant ) শোনা যাবে। এইভাবে আঙ্গুল ঠুকে পরীক্ষা করলে লিভার এবং হৃৎপিন্ডের উপরেও জোরাল অনুরণন শোনা যেতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ দুই এলাকায় আওয়াজ থাকে নিম্নগ্রামের ( Dullness )।

স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের উভয় পর্যায়ে ব্রংকাই-এর ( Ronchii ) 'সোঁ-সোঁ' আওয়াজ শোনা যায়; শ্বাস নেওয়ার আওয়াজ খুব স্বল্পস্থায়ী এবং শ্বাস ছাড়ার আওয়াজ দীর্ঘস্থায়ী। এ ছাড়া মাঝে মাঝে ক্রেপিটেশনও ( Crepitation or fine rales ) শোনা যায়।

'স্টাটাস্ অ্যাজমাটিকাসে' আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সব লক্ষণ ও নিদর্শন থাকে ; তবে যাদের রক্তে কার্বন-ডাই-অকসাইড-এর পরিমাণ বৃদ্ধিপায় তাদের জিভ, ঠোঁট ও হাত-পায়ের নখে নীল আভা ( Cyanosis ) দেখা যায়। প্রয়োজন মত জল পান না করার জন্য প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমে যায়। গুরুতর রোগীদের বুকে সোঁ-সোঁ আওয়াজ শোনা যায় না, অনেক সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও শোনা যায় না বললেই হয়। এই অবস্থাকে বলা হয়েছে 'নীরব বক্ষ' ( Silent chest ) ; এই ধরনের রোগীদের সেরে ওঠা খুবই কঠিন।

যে-সব হাঁপানি রোগীর শ্বাস পথে বীজাণু বা ভাইরাসের আক্রমণের জন্য পরিবর্তন হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের সব এলাকাতেই ক্রেপিটেশন শোনা যায়। বুকের নানা এলাকাতে ব্রংকাই-এর আওয়াজও শোনা-যায়, তবে এই ধরনের রোগীদের বেলা অনেক কম।

### C. পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান

হাঁপানি রোগের কারণে এবং দীর্ঘদিন রোগ ভোগের ফলে রোগীর শরীরে কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণের জন্য ল্যাবরেটারীতে নানা ভাবে পরীক্ষা করে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের উপর আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক পরীক্ষা আছে যার সুযোগ আমাদের দরিদ্র লোকেরা নিতে পারেন না, অথবা আমাদের দেশের খুব অল্প কয়েকটি হাসপাতালে সেই সব পরীক্ষার সুযোগ আছে। সুতরাং যেসব পরীক্ষা আমাদের সাধারণ হাসপাতালে হওয়া সম্ভব, তার উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে। তবে যদি ধৈর্য ধরে রোগের ইতিহাসের অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে আমরা বহু ব্যায় সাধ্য কঠিন পরীক্ষা না করেও রোগীকে সঠিকপথে চিকিৎসার সুযোগ দিতে পারি।

হাঁপানি রোগীর ইতিহাস জানার জন্য সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। ইতিহাস নেওয়ার সময় তার বিবরণ লিখে নেওয়া উচিত। একটি প্রশ্ন তালিকা করে রাখলে ভাল হয়। রোগীর উত্তর ঐ তালিকার পাশে লিখে নেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি তালিকাটি নিম্নোক্ত ধরণে করা যেতে পারে। চিকিৎসক নিজের প্রয়োজন মত এই তালিকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।

প্রশ্নাবলী নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে করা যেতে পারে ঃ

1. কি ভাবে হাঁপানির আক্রমণ হয় ?
2. কত বছর বয়সে প্রথম আক্রমণ হয়েছিল ?
3. সাধারণত আক্রমণ স্থায়ী হয় কতক্ষণ ?
4. কি ভাবে রোগ উপশম হয় ? কোন ওষুধ লাগে না বিনা ওষুধেই ভাল হয় ?
5. আক্রমণের পূর্বে হাঁচি বা নাক দিয়ে জল পড়ে কি না ?
6. রোগীর নিজের একজিমা বা অ্যালার্জি আছে কি না ?
7. একটি আক্রমণের পরে পরবর্তী আক্রমণ পর্যন্ত রোগী কি পুরো-পুরি সুস্থ থাকে ?
8. রোগীর কি সব সময়ে একটু শ্বাসকষ্ট থাকে এবং মাঝে মাঝে এই কষ্ট কি বৃদ্ধি পায় ?
9. বছরের কোন সময় হাঁপানি বেশী হয় ?
10. হঠাৎ ঠাণ্ডা বা গরমে হাঁপানি আরম্ভ হয় কি না ?
11. কোন কারণে ঘরে ধুলো উড়লে হাঁপানির আক্রমণ আরম্ভ হয় কি না ?
12. হাঁপানি পরিশ্রমের পরে আরম্ভ হয় কি না ?
13. কোন মানসিক চাপ বা আঘাত আসার পরে আক্রমণ হয় কি না ?
14. বিশেষ কোন খাদ্য খাওয়ার পরে হাঁপানি হয় কি না ? ( বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে ) ।

আমি রোগী বা তার আত্মীয়দের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা রাখতে উপদেশ দিই । সেই সঙ্গে দৈনন্দিন শরীরের অবস্থা লিখে রাখতে বলে দিই । এর ফলে কোন খাবার খাওয়ার পরে হাঁপানি হচ্ছে কিনা তা নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় । যদি কোন কারণে ওষুধ খেতে হয় তাও লিখে রাখা উচিত ।

উপরের দীর্ঘ তালিকা ছাড়া আরও একটি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন জেনে নেওয়া দরকার । সেটি হল—রোগীর নিজের অ্যালার্জি, একজিমা না থাকলেও, ভাই-বোন মা-বাবা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী, মামা-কাকা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দের কারও হাঁপানি, অ্যালার্জি বা একজিমা আছে কিনা বা ছিল কিনা । এই জাতীয় রোগ প্রথম শ্রেণীর আত্মীয়দের মধ্যে থাকলে রোগের বংশানুক্রমিক ধারা প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা মনে রাখা উচিত ।

ধৈর্য্য ধরে রোগীর আনুপূর্বিক ইতিহাস নেওয়া হলে অনেক ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা এড়ান যেতে পারে। তবে আমি ঐ পরীক্ষা সমূহ অপ্রয়োজনীয় তা বলতে চাই না। হাঁপানির কারণ ও শরীরের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য বহু পরীক্ষার প্রয়োজন। তার মধ্যে যে-সব পরীক্ষা আমাদের দেশের বেশীরভাগ রোগীর সাধ্যায়ত্ব সেগুলি একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(a) **এক্স্-রে (X-Ray)** ঃ বুকের এক্স্-রে পিছনে-সামনে ও পাশ থেকে দুভাবে নেওয়া দরকার। যে সব রোগীর শুধু হাঁপানি আছে এবং অন্য কোন জটিলতা নেই, তাঁদের ছবিতে কোন দোষ দেখা নাও যেতে পারে। তবে হাঁপানির প্রথম অবস্থার ছবি স্বাভাবিক হলেও অনেক দিন রোগ ভোগের পরবর্তী সময়ের ছবি ফুসফুসে যে সব ব্যাধিজনিত পরিবর্তন হয় তার উপর আলোকপাত করতে পারে। হাঁপানি ছাড়া বুকের অন্যান্য রোগেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে ; যেমন, ফুসফুস ফুটো হয়ে প্লুরার মধ্যে হাওয়া জমলে কিংবা প্লুরার থলির মধ্যে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং এক্স্-রে ছবিতে তা দেখা যায়। শ্বাসকষ্টের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য বুকের এক্স্-রে পরীক্ষা অপরিহার্য্য।

ফুসফুসের অ্যালভিওলাই-কোষ বা শেষ পর্য্যায়ের শ্বাসনলীর (Respirations Bronchiole) অসুখ, এমফিসিমা ( Emphysema ) প্রভৃতি রোগ এক্স্-রে ছবির সাহায্যে সহজেই চেনা যেতে পারে।

(b) **রক্ত পরীক্ষা ঃ** অপর এক সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পদ্ধতি হল শ্বেতকণিকার সংখ্যাগণনা ও তাদের শ্রেণী বিভাগ। আগেই বলা হয়েছে, এক শ্রেণীর হাঁপানি রোগীর শ্বাসনলীতে বীজাণু আক্রমণ হতে পারে ; শ্বেতকণিকা গণনা এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য বেশীর ভাগ হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না—যদিও ইয়োসিনোফিল কোষের সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে, তাও সাধারণত শতকরা 10 এর বেশী নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা 30 পর্য্যন্ত বেড়ে যায় বটে, কিন্তু এই ধরনের রোগীর সংখ্যা খুব কম।

(c) **কফ্ পরীক্ষা ঃ** সব হাঁপানি রোগীর রোগ নির্ণয় ও কারণ অনুসন্ধানের জন্য কফ্ পরীক্ষা অবশ্য করণীয়। হাঁপানি রোগীর কফ্ নানা রকম হতে পারে। যখন হঠাৎ মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়, তখন প্রথম দিকে

কাশি থাকে তবে কফ্ নির্গত হয় না। কিছু সময় পরে যখন হাঁপানি কমতে থাকে, সেই অবস্থায় রোগী বিশেষ এক প্রকার কফ্ তোলে। সেটি যেন গোল করে পাকান – জলে দিয়ে সাবধানে তার পাক খোলা যায়। ঐ কফের শ্লেষ্মা ব্রংকাই-এর ছাঁচে তৈরী, নাম দেওয়া হয়েছে "কার্সম্যান'স্ স্পাইরাল্স্" (Curschman's spirals); বেশ কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা। এর মধ্যে ইয়োসিনোফিল কোষ ও শারকট্-লিডেন ক্রিস্টাল দেখতে পাওয়া যায় (৫৬-২ ও ৬৫-৮)

যখন হাঁপানির সঙ্গে শ্বাসনলীতে বীজাণু সংক্রমণ থাকে, সেই অবস্থায় কফ্ হতে পারে হলুদ পুঁজের মত অথবা ফিকে সবুজ রঙের। এই কফ কালচার * করা উচিত এবং সেই বীজাণুর উপর কোন ওষুধ কার্যকরী হবে, তাও পরীক্ষা করে (Drug sensitivity) সেই বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। কারণ, হাঁপানি রোগীরা প্রায়ই নিজের খেয়াল-খুশী মত ওষুধ খায় এবং সেই ওষুধের মাত্রা ও সেবনের সময়সীমা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকমত মেনে চলা হয় না, ফলে কোন কোন ওষুধ আক্রমণকারী বীজাণুর উপর কার্যকর নাও হতে পারে। অনিয়মিত সেবনে কোন কোন শ্রেণীর বীজাণু ওষুধ প্রতিরোধক হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্য কোন ওষুধটি হানিকর বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করতে পারবে সেটা আগে থেকে জেনে নেওয়া ভাল।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসপথে ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে। কফ্ পরীক্ষা করার সময়ে সেই সম্ভাবনার কথা মনে রাখা উচিত।

(d) অ্যালার্জি টেস্ট :

এই পরীক্ষা করা হয় অ্যান্টিজেন দিয়ে। শরীরের ভিতরের অ্যান্টিবডি বাইরে থেকে প্রয়োগ করা অ্যালার্জেন-এর সঙ্গে মিশে এমন এক ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা দেখে বোঝা যায় বিশেষ কোন পদার্থের প্রতি রোগী অতি সংবেদনশীল কি না। এই পরীক্ষা নানাভাবে করা যায়; ত্বকের মধ্যে ইনজেকসন দেওয়া, চামড়ায় ছুঁচ ফুটিয়ে অ্যান্টিজেন দেওয়া,[৫২] চোখে অ্যান্টিজেন মিশ্রিত ফোঁটা দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা, ব্রংকাসের ভিতরে অ্যান্টিজেন ছিটিয়ে (Spray) দেওয়া বা নাকে অ্যান্টিজেনের গুঁড়ো শুঁকতে

* কোন তরল অথবা কঠিন মাধ্যমে (media) বীজাণুদের বংশবৃদ্ধি করান।

দেওয়া ([63])। এই সব পরীক্ষা কখনও কখনও অতি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জীবন সংশয় ঘটাতে পারে। সেইজন্য হাসপাতালে যেখানে এই ধরনের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার ঠিকমত চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেখানেই করা উচিত। হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসার জন্য চামড়ায় ছুঁচ ফুটিয়ে পরীক্ষা করা নিরাপদ। তবে সেখানেও অ্যাড্রিনেলিন ও কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ হাতের কাছে রাখতে হবে। সম্ভব হলে অকসিজেন সিলিণ্ডার ও পজিটিভ চাপে শ্বাসকার্য চালু রাখার যন্ত্র রাখতে পারলে ভাল হয়।

সাধারণ হাঁপানি রোগীদের অ্যালার্জেন পরীক্ষার জন্য ত্বকের উপর অ্যাণ্টিজেন প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়। তার মধ্যে ত্বকে একফোঁটা অ্যাণ্টিজেন দিয়ে, সেখানে ছুঁচ ফুটিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি চিকিৎসকরা বেশী পছন্দ করেন ( চিত্র 1 : ক ) কারণ ইনজেকসন দিতে হলে 0 1 মিলিলিটার অ্যাণ্টিজেন ত্বকের 'মধ্যে' দিতে হবে ( নীচে নয় )। তার সরঞ্জাম হিসাবে দরকার 20টি টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ ; যা দেখে শুধু শিশুরা নয়, অনেক বয়স্ক মানুষও ভীত হয়ে পড়েন, কেউ বা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন নির্ণয় করা কঠিন হতে পারে যে এই অবস্থা ধমণীর উপর আহত ভেগাস স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া ( Vasovagal syncope ) না অ্যালার্জেন জনিত প্রতিক্রিয়া।

### (d·i) অ্যান্টিজেন পরীক্ষার নীতি কি ?

আমাদের ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লীর মধ্যে থাকে মাস্‌ট্‌ কোষ ( Mast cell )। কোন অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীরে যে অ্যান্টিবডি বা প্রতিরোধক পদার্থ সৃষ্টি হয় সেটি মাস্‌ট্‌ কোষের উপরে লেগে থাকে। এই অ্যান্টিবডি আই, জি-ই ( IgE ) শ্রেণীর। পরবর্তী সময়ে একই শ্রেণীর অ্যান্টিজেন যদি ঐ মানুষের শরীরে আবার প্রবেশ করে, তখন নতুন অ্যান্টিজেনের সঙ্গে মাস্‌ট্‌ কোষের গায়ে লেগে থাকা অ্যান্টিবডির সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার ফলে মাস্‌ট্‌ কোষের গায়ে একধরণের প্রোটিন-বিশ্লেষক এনজাইমের ( Proteolytic enzyme ) প্রভাবে মাস্‌ট্‌ কোষের ভিতর থেকে দানাগুলি বেরিয়ে আসে (চিত্র—10)। দানাগুলি খুব ছোট্ট থলির মত ; তার মধ্যে হিস্টামিন, হেপারিন, এস-আর-এস-এ ( Slow reacting substance—Anaphylaxis ) প্রস্‌টাগ্লানডিন জাতীয় অ্যামাইন ( amine ) তাদের অপরিণত পূর্বাবস্থায়

উপস্থিত থাকে। থলি থেকে বেরিয়ে আসার পরে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ অ্যামাইনগুলি পরিণত স্বরূপে সংগঠিত হয় এবং অতঃপর তারা শরীরে কোষ ও টিস্যুর মধ্যস্থিত তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে নানা রকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
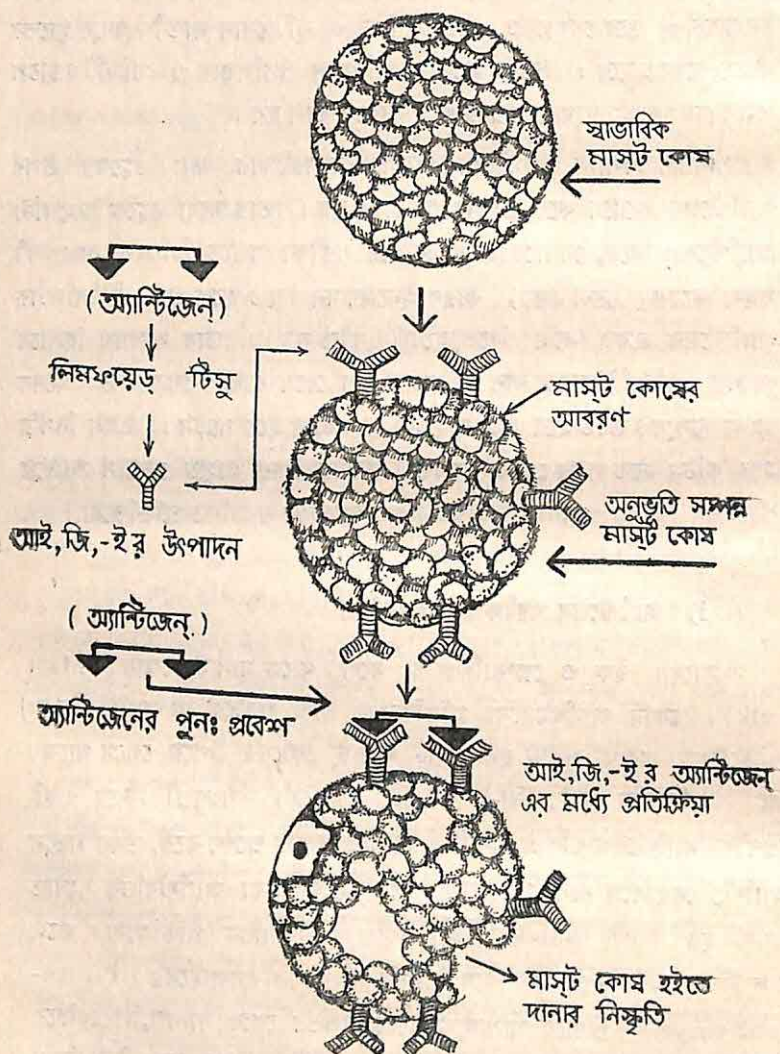
চিত্র —10 ক

মাস্‌ট কোষের প্রতিক্রিয়ার কাল্পনিক রেখাচিত্র

চিত্র -10.খ

অ্যালার্জেন ও তার প্রতিক্রিয়া
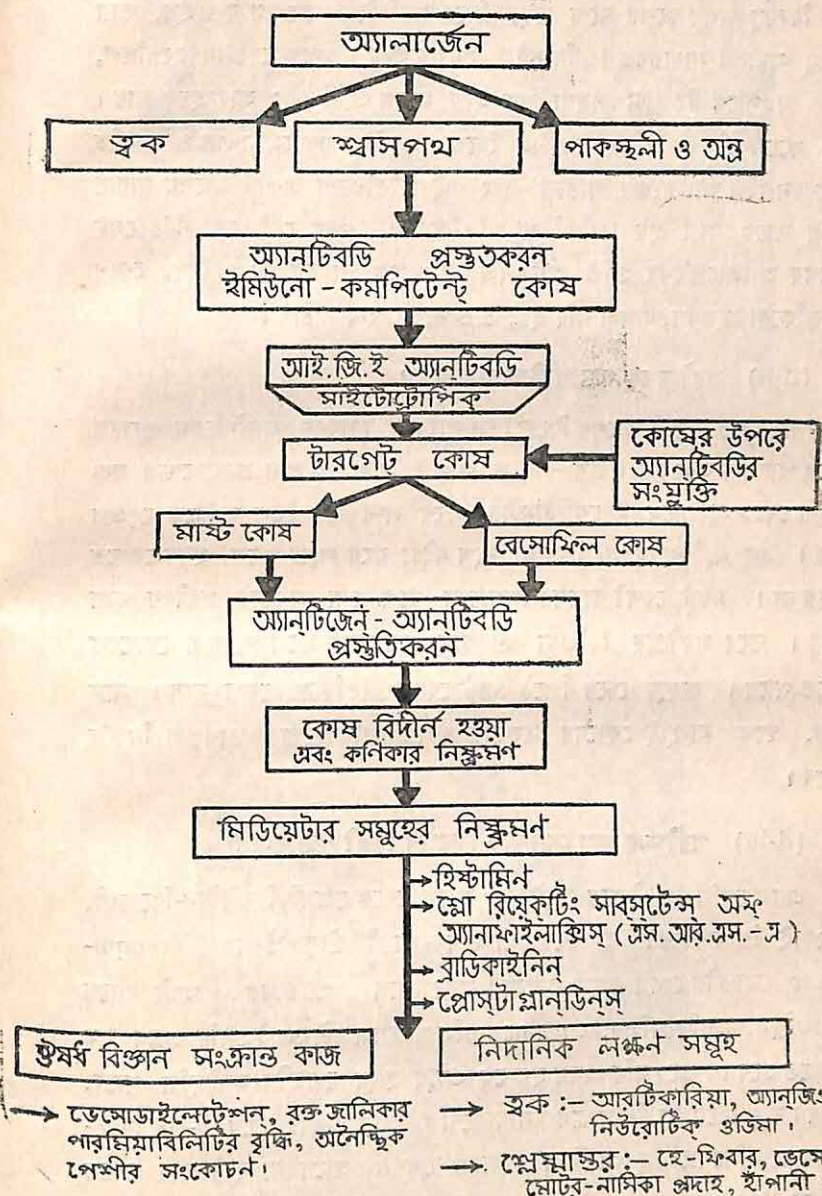
কিন্তু যখন ত্বকের মধ্যে ছুঁচ দিয়ে অ্যান্টিজেন প্রয়োগ করা হয়, তার কিছু সময় ( সাধারণত 15 মিনিট ) পরে যেখানে ছুঁচ ফোটান হয়েছিল, তার চারপাশে কিছুটা জায়গা শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে এবং লাল হয়ে যায়। এই ফুলে ওঠা ও লাল হওয়াটাই বিশেষ একটি অ্যালার্জেন এর প্রতি অতি সংবেদনশীল অ্যালার্জির পরিচয় এবং এই প্রতিক্রিয়া একটি বিশেষ মাত্রায় এলে তাকে বলা হয় 'পজিটিভ' প্রতিক্রিয়া। যদি সেই লোকটির সেই বিশেষ অ্যালার্জেনের প্রতি অ্যালার্জি না থাকে তাহলে ত্বকের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, অথবা যদি হয়, তাও খুবই কম মাত্রায়।

### (d-ii) শরীরে কোথায় পরীক্ষা করা হয় ?

সাধারণত বাহুর পাশের দিকে তিন সারিতে বিভিন্ন অ্যান্টিজেন প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয় ( চিত্র—11-ক ও খ ) শিশুদের জন্য মেরুদণ্ডের মধ্য রেখা থেকে দু'পাশে 2 সেন্টিমিটার দূরে লম্বভাবে তিন সারিতে দেওয়া হয়। এর সুবিধা হোল, শিশুরা মুখ নীচু করে শুয়ে থাকে, ছুঁচ দেখতে পায় না। একটু বেশী বয়সের শিশুদের টুলে বসা অবস্থায় পরীক্ষা করা যায়। তবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষার ফলে সামান্য হেরফের হতে পারে। বাহুর চেয়ে পিঠে একটু বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মনে হয়, ত্বকে মাস্‌ট্‌ কোষের সংখ্যার উপর প্রতিক্রিয়ার তারতম্য নির্ভর করে।

### (d-iii) পরীক্ষার জন্য রোগীকে কিভাবে তৈরী করা হবে ?

এ্যালার্জেন পরীক্ষার দুইদিন আগে থেকে রোগী হিস্টামিন-বিরোধী, ব্রংকাই শিথিলকারী বা উত্তেজনা প্রশমনকারী ট্রেংকুলাইজার ( Tranquilizer ) জাতীয় কোন ওষুধ ব্যবহার করবে না। পরীক্ষার 8 ঘণ্টা আগে এফিড্রিন, অ্যাড্রিনেলিন, আইসোপ্রেনালিন, স্যালবুটামল ইত্যাদি ওষুধ বন্ধ করতে হবে। তবে যদি এমন হয় যে ওষুধ ছাড়া রোগীর কষ্টবৃদ্ধি পাবে, তখন মুখ দিয়ে বা শিরাপথে অ্যামাইনোফাইলিন অথবা মুখে 5-10 মিলিগ্রাম প্রেডনিসোলোন পরীক্ষা সময়ের দুঘণ্টা আগে ব্যবহার করা যেতে পারে ([64])।

### (d-iv) পরীক্ষার পদ্ধতি

যেখানে ছুঁচ ফোটান হবে সেখানে শতকরা 70 ভাগ অ্যালকোহল দিয়ে

চিত্র 11—ক
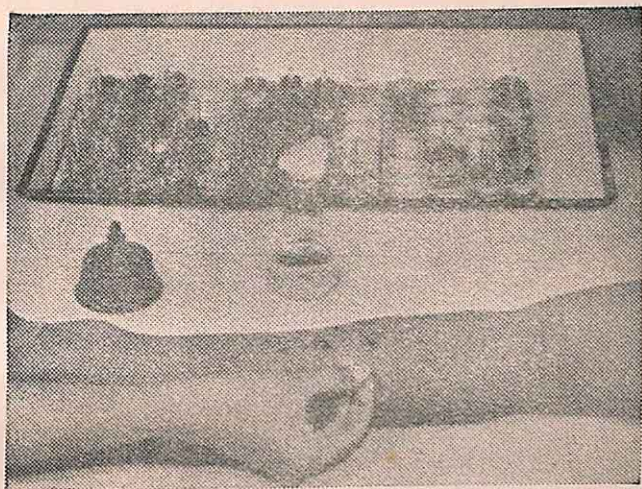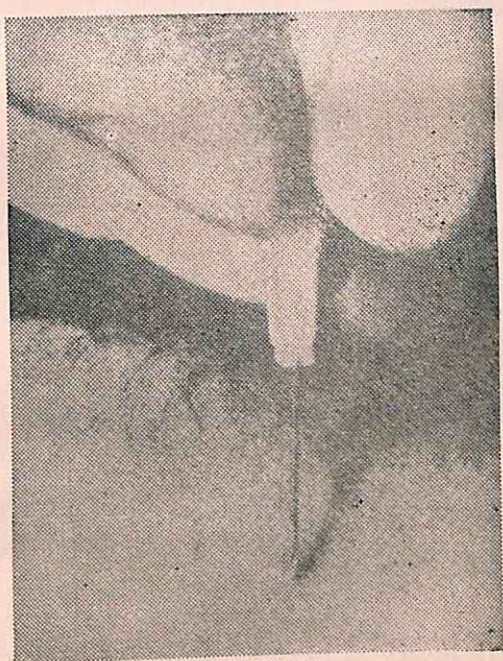
চিত্র 11—খ
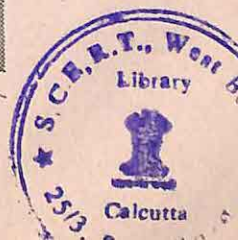
চামড়া পরিষ্কার করে নিতে হবে। অ্যালকোহল শুকিয়ে গেলে এক ফোঁটা অ্যালার্জেন চামড়ার ওপর দিয়ে সেখানে ছুঁচ ফুটিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্র পরস্পরের থেকে 5 সেন্টিমিটার দূরে থাকবে। অ্যালার্জেন ছাড়া অন্য দুটি চিহ্নিত এলাকায় শুধু স্যালাইন দিয়ে 'নেগেটিভ কন্ট্রোল' ও স্যালাইন-এর সঙ্গে হিস্টামিন অ্যাসিড ফসফেট মিশিয়ে 'পজিটিভ কন্ট্রোল' রাখা হয়। প্রয়োগ পদ্ধতি অ্যালার্জেনের মতই। অনেক সময় কোন লোকের একাধিক অ্যালার্জেনে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তার মধ্যে বিশেষ কোনটি দোষী খুঁজে বার করা শক্ত। সেজন্য কয়েক দিন পরে অল্প সংখ্যক অ্যালার্জেন দিয়ে আবার পরীক্ষা করা ভাল।

অ্যালার্জেন প্রয়োগ করার আগে নরম্যাল সেলাইন মিশিয়ে তরল করে নিতে হয়। তরলীভূত করার মাত্রা নির্ভর করে কি প্রকৃতির অ্যালার্জেন ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরে। বেশীর ভাগ অ্যালার্জেন 1 : 500 মাত্রায় তরল করে নেওয়া হয় ; কিন্তু পতঙ্গের অ্যান্টিজেন তরল করা হয় 1 : 2500 এবং মাইট অ্যান্টিজেন 1 : 5000 মাত্রায়। আবার পোলেন অ্যান্টিজেন সাধারণত 1 : 1000 মাত্রায় তরল করে ব্যবহার করা হয়।

প্রতিক্রিয়া দেখা হয় অ্যান্টিজেন প্রয়োগের 15 মিনিট পরে এবং ফুলে ওঠা ও রক্ত বর্ণ জায়গার ( Induration and Erythema ) পরিমাণ মিলিমিটার স্কেলে মাপা হয়। শিবপুরী [64] পজিটিভ প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ অনুসারে চার ভাগে ভাগ করার সুপারিশ করেছেন।

নেগেটিভ— : ফুলে ওঠা এলাকার পরিমাণ 3-4 মিলিমিটার এবং ত্বকে রক্তিম আভা থাকে না।

প্রতিক্রিয়া + : ত্বকের স্ফীতি নেগেটিভ-এর চেয়ে 6 মিলিমিটার বেশী এবং ত্বকের রক্তিম আভার পরিমিতি ফুলে ওঠা স্থানের দ্বিগুণ।

প্রতিক্রিয়া ++ : ত্বকে ফুলে ওঠা স্থানের পরিমিতি আগেরটির প্রতিক্রিয়ার চেয়ে 3 মিলিমিটার বেশী। রক্তিম আভার পরিমিতি ফুলে ওঠা স্থানের দ্বিগুণ।

প্রতিক্রিয়া +++ : ত্বকের স্ফীতির পরিমিতি আগেরটির চেয়ে 3 মিলিমিটার বেশী ; এছাড়া দু' একটি ছোট ছদ্মপদ

রেখা ( Pseudopodia ) দেখা যায়। ত্বকের রক্তিম আভা ফুলে ওঠা স্থানের দ্বিগুণ বেশী।

প্রতিক্রিয়া ++++ ফুলে ওঠা স্থানের পরিমিতি আগেরটি চেয়ে 3 মিলি-মিটার বেশী; এছাড়া অনেক ছদ্মপদ রেখা দেখা যায়। ত্বকের রক্তিম আভার পরিমিতি ফুলে ওঠা স্থানের দ্বিগুণ মাপের।

অ্যান্টিজেন-এর প্রতিক্রিয়ার মাত্রা মেপে এক বা একাধিক যোগ চিহ্ন (+) দিয়ে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা প্রকাশ করা হয়। সাধারণত একটি বা দুটি '+' চিহ্নকে পজিটিভ বলে ধরা হয় না, তিন ও চারটি '+' চিহ্ন পজিটিভ বলে গণ্য হয়। এ ছাড়া ছদ্মপদরেখা ( Pseudopodia ) জোরাল পজিটিভ প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন।

এই পরীক্ষা দ্বারা কোন রোগীর হাঁপানি অ্যালার্জি ঘটিত কিনা সেটা নির্ণয় করা সম্ভব। ক্ষেত্র বিশেষে অ্যালার্জেন খুব বেশী মাত্রায় তরল করে ইনজেকসন দিয়ে রোগীকে সেই অ্যালার্জেন-এর প্রতি অ-সংবেদনশীল ( Desensitise ) করে হাঁপানি রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

(e.) **ফুসফুসের কর্মক্ষমতার পরীক্ষা ( Lung Function Test ) ঃ**

বছর তিরিশ আগে ফুসফুসের ক্ষমতা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতবেশী, তা—ঠিক মত জানা ছিল না। তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্রদের শুধু ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা ( Vital capacity ) অথবা স্বাভাবিক ভাবে কি পরিমাণ বাতাস গ্রহণ করছে বা ত্যাগ করছে ( Tidal volume ), সেই বিষয়ে অল্প কিছু শিক্ষা দেওয়া হোত। চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা পরীক্ষার গুরুত্ব ছিল অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমশ এই পরীক্ষা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচলিত হয়েছে। (চিত্র—12)

হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা জানতে পারি, (1)
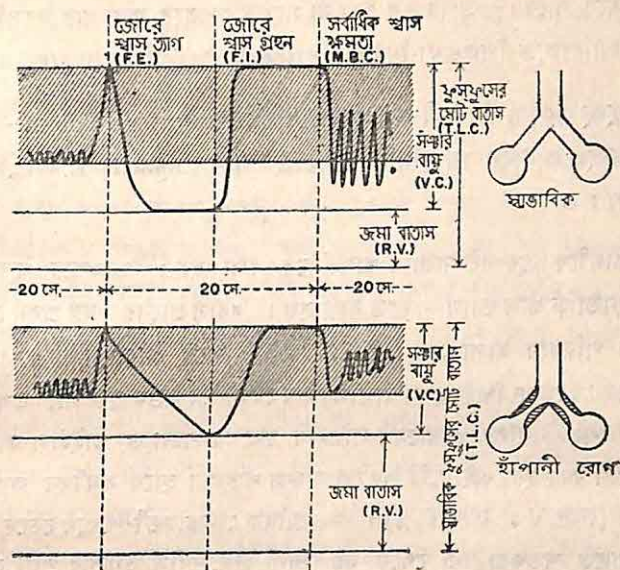
চিত্র -12

শ্বাসনলীতে বায়ু চলাচলে কি পরিমাণ বাধা সৃষ্টি হয়েছে ; (2) সেই বাধা অপসারণ করা সম্ভব কিনা ; (3) কোন বিশেষ ওষুধ ব্যবহারে, এই বাধা দূরীভূত হয় কিনা ; (4) শিরা ও ধমনীর রক্তস্রোতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ কত ।

এর মধ্যে শেষের পরীক্ষার জন্য মূল্যবান যন্ত্র ও ব্যবহারিক জ্ঞানের দরকার ; কিন্তু প্রথম তিনটি পরীক্ষা খুবই সহজ । যে কোন হাসপাতালে এমন কি ডাক্তারের চেম্বারে বা রোগীর বাড়ীতেও যন্ত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষা করা যায় ।

তিন-চারটি যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষমতা নিরূপণ করা সম্ভব । তার একটি হোল এক্সপিরোমিটার ( Expirometer ) এই যন্ত্রটি বড় না হলেও খুব ছোট নয় এবং সব জায়গায় বহন করা সম্ভব নয় । এর বদলে একটি ছোট যন্ত্র রেসপিরোমিটার ( Respirometer ) ব্যবহার

করা যেতে পারে। অপর এক যন্ত্র যা সহজে ব্যবহার করা যায়, সেটি হোল রাইট আবিষ্কৃত পিক-ফ্লো-মিটার (Wright's Peak flow meter)।

**ফোরস্‌ড্‌ এক্‌সপিরেটারী ভল্যুম (Forced Expiratory Volume- F.E.V) ও ফোরস্‌ড ভাইটাল ক্যাপাসিটি (Forced Vital Capacity-E.V.C.) পরীক্ষা:**

রোগীকে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিতে বলা হয়; তারপরে খুব জোরে ও তাড়াতাড়ি শ্বাস ত্যাগ করতে বলা হয়। শ্বাস ছাড়ার সময় প্রথম সেকেণ্ডে বায়ুর পরিমাণ মাপা হয় ( $F.E.V._1$ )। পরে আবার জোরে শ্বাস নিয়ে এবং জোরে ছেড়ে দিয়ে যখন বাতাস আর বের করা সম্ভব হয় না, তখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাতাসের পরিমাণ মেপে ফোরস্‌ড্‌ ভাইটাল ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করা হয়, এই দুটি পরীক্ষার ফল শতকরা হারে সমীক্ষা করা যেতে পারে (F.E.V : F.V.C %)। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ও বয়স অনুপাতে শতকরা 65 থেকে 80 ভাগ বায়ু শ্বাস ত্যাগের প্রথম সেকেন্ডে বের করে ফেলা সম্ভব।

এই পরীক্ষা দুটির আনুপাতিক হার পর্যালোচনা দ্বারা কয়েকটি রোগ নির্ণয় ও কয়েকপ্রকার ওষুধের কার্যকারিতা নিরূপণ করা সম্ভব। যেমন, হাঁপানি ও ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস রোগে, যেখানে শ্বাসনলীর ব্যাস সরু হয়ে যায়, সেখানে F.E.V. : F.V.C.'র আনুপাতিক হার শতকরা 40 বা তার চেয়েও কম হতে পারে। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করে হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রে শ্বাসনলীতে বায়ু চলাচলের উন্নতি হলে ঐ আনুপাতিক হারেরও উন্নতি দেখা যায় এবং সেই বিশেষ ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

অপরদিকে এমফাইসিমা প্রভৃতি রোগে ফুসফুস-কোষের স্থিতিস্থাপকতা যদি কমে যায় কিংবা পঞ্জরাস্থি ও মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি যদি তাদের স্বাভাবিক সচলতা হারিয়ে ফেলে, যেমনটি হয় এনকাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিস রোগে, সেক্ষেত্রে কিন্তু F.E.V. : F.V.C.-এর হারের কোন হেরফের হয় না। কারণ এতে দুই প্রকারের পরীক্ষার হার সমান ভাবে কমে যায়। এই ধরনের রোগে কোন ওষুধেই শ্বাস ত্যাগ করার সময়ে বায়ুর পরিমাণ বাড়ে না।

সজোরে যখন শ্বাসত্যাগ করা হয়, সেক্ষেত্রে বায়ুর পরিমাণ রাইট আবিস্কৃত পিক-ফ্লো-মিটার দিয়ে মাপা সম্ভব। যন্ত্রটি ছোট এবং চিকিৎসক এটি নিজের চেম্বারে রাখতে পারেন অথবা রোগীর বাড়ীতেও নিয়ে যেতে

পারেন। এর দ্বারা হাঁপানি রোগীর শ্বাসত্যাগ করতে কি পরিমাণে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তা খুব সহজে নিরূপণ করা যেতে পারে।

যখন কোন যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় না তখন গলাতে ট্রেকিয়ার উপরে স্টেথোসস্কোপ রেখে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তা অনুমান করা সম্ভব। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ 4 সেকেন্ডে ফুসফুস থেকে যেটুকু বাতাস বের করা সম্ভব, তা করতে পারে। যদি এই সময়সীমা 6 সেকেন্ডের বেশী হয়, তখন শ্বাসপথে বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা সন্দেহ করা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে **F.E.V. : F.V.C**-এর আনুপাতিক হার শতকরা 50-এর কম হতে দেখা যায়।

এ ছাড়া ধমনীতে অকসিজেন ও কার্বন ডাই অকসাইড-এর পরিমাণও বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব। রক্তের পি-এইচ (pH) পরিমাপ করে অম্ল–ক্ষারের (acid-base) সমতা ঠিক আছে কিনা সে বিষয়েও আমরা জানতে পারি। তবে এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার বড় বড় হাসপাতালেই সম্ভব।

কোন লোকের ফুসফুসের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা জানতে হলে কেবলমাত্র ফুসফুসে বাতাস ঠিকমত যাতায়াত করছে কিনা সেটুকু জানলে হবে না;
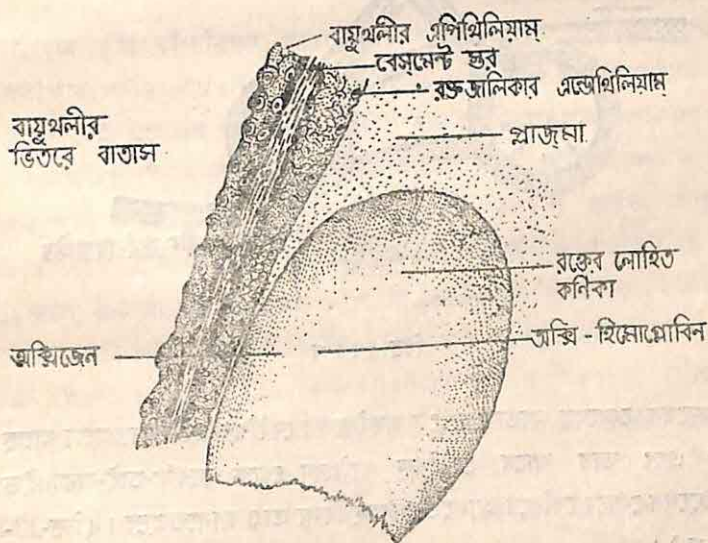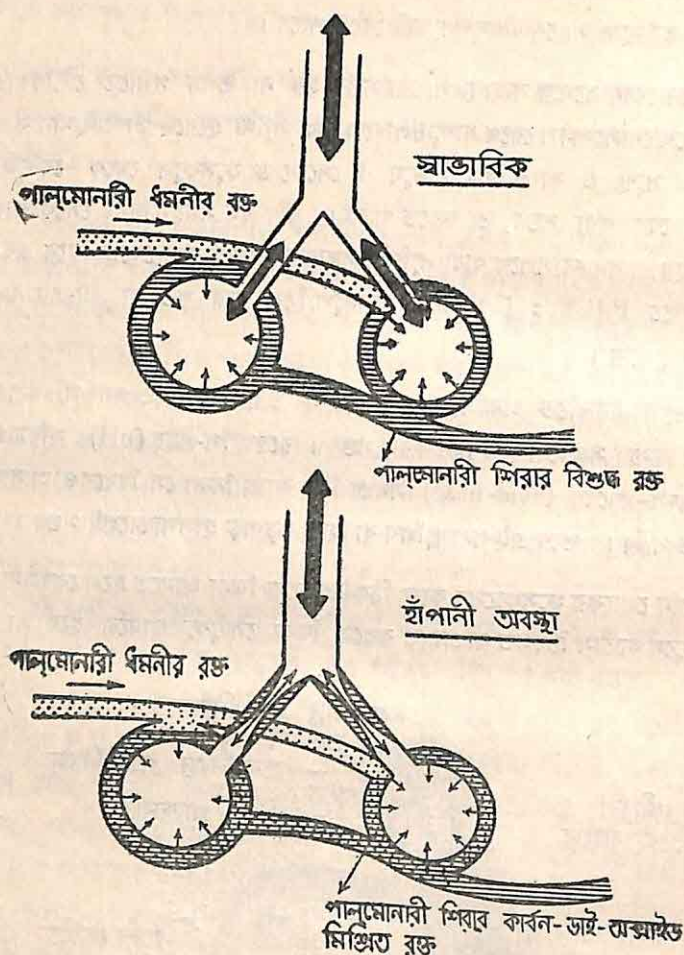
চিত্র—13 ক

চিত্র—13 খ

ফুসফুসের কোষের বাতাস থেকে অকসিজেন কৌশিক জালিকার মধ্যে যাচ্ছে কিনা এবং তার আগে কৌশিক জালিকা থেকে কার্বন-ডাই-অকসাইড ফুসফুসের কোষে বেরিয়ে আসতে পারছে কিনা তাও জানতে হবে। (চিত্র-13-ক ও খ)।

ধমনী রক্তে অকসিজেন ও কার্বন-ডাই'অকসাইড পরিমাপ করে এই তথ্যটি

জানা যায়। স্টাটাস অ্যাজমাটিকাস বা অবিরাম তীব্র হাঁপানিতে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন।

**(f) এনজাইম-হরমোন-অ্যাণ্টিবডি পরিমাপ :**

কয়েকবছর আগে বিজ্ঞানীরা হাঁপানি রোগীকে পরীক্ষার পরে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাদের রক্তে এস-জি-ও-টি (S.G.O.T.), এল-ডি-এইচ (L.D H) ও সি-পি-কে (C.P.K.) প্রভৃতি এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল, টিস্যুতে অক্সিজেনের অভাবের জন্য এনজাইমগুলি বেড়ে গিয়েছে। পরে আরও গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে, শ্বাসকার্যের জন্য পেশীর অতিরিক্ত কাজের ফলেই এই বৃদ্ধি [65]। ল্যাক্টিক ডি হাইড্রোজেনেজ এনজাইম-এর বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার পরে দেখা গিয়েছে, এনজাইমের যে অংশ ফুসফুস থেকে এল-ডি-এইচ-৩ রূপে পাওয়া যায় সেই ভগ্নাংশটিই বেড়ে যায় [66]। এ ছাড়া যাদের অন্তর্জাত হাঁপানি আছে তাদের রক্তের সিরামে আর এক এনজাইম আলফা$_1$ অ্যান্টিট্রিপসিন এনজাইম-এর পরিমাণও বৃদ্ধি পায় [67]।

অবিরাম তীব্র হাঁপানিগ্রস্ত (Status Asthamaticus) রোগীদের উপর এক সমীক্ষায়, এ-ডি-এইচ (A.D.H.) হরমোনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই হরমোনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে (1) বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পরিমাণ ; (2) ক্যারোটিড বডিতে রক্ত চাপের প্রতিক্রিয়া এবং (3) হাইপোথ্যালামাস। বিভিন্ন স্থান থেকে অনুভূতি চলে যায় দেহের নির্দিষ্ট গ্রাহক যন্ত্রে (receptors)। হাঁপানি রোগে ফুসফুসের ধমনীর ভিতরে রক্ত সঞ্চালন মন্থর হয় ; ফলে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তকম আসে, ক্যারোটিড ধমনীতেও রক্তচাপ কমে যায়, তার প্রতিফলন পড়ে কারোটিড বডিতে এবং শরীরের জল সংরক্ষণের জন্য ঐ হরমোনের ক্ষরণও বেড়ে যায়। স্টাটাস অ্যাজম্যাটিকাস রোগীদের চিকিৎসায় শিরাপথে জলীয় পদার্থ ইনজেকসন দেবার সময় এই তথ্যটি স্মরণ রাখা দরকার যাতে বেশী পরিমাণে তরল ওষুধ ইনজেকসন দিয়ে রোগীর কোন বিপদ না ঘটে[68]। এছাড়া যাদের বহির্জাত হাঁপানি থাকে তাদের সিরামে আই, জি-ই-এর (IgE) পরিমাণ যে বৃদ্ধি পায়, এ বিষয়ে আজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

(g) **ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাফ ( E.C.G. )**

খুব গুরুতর ধরণের হাঁপানি আক্রমণের সময় ই-সি-জি পরীক্ষায় কিছু অস্বাভাবিক চিত্র দেখা যেতে পারে। আক্রমণ উপশম হলে ই-সি-জি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে অনেক দিনের পুরানো রোগীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা আর নাও ফিরে আসতে পারে।

আক্রমণের সময় হৃদপিণ্ডের সাইনাসের উত্তেজনার জন্য অস্বাভাবিক দ্রুত হৃৎস্পন্দন (Sinus Tachycardia) প্রায় সব রোগীর ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। হৃৎপিণ্ডের অক্ষরেখা (axis) ডান দিকে সরে যায় এবং হৃৎপিণ্ড ঘুরে যায় ঘড়ির বড় কাঁটার পথে (Clockwise rotation of heart)। যারা অনেকদিন হাঁপানিতে ভুগেছে তাদের ডানদিকের ভের্নাট্রিকলের পেশী পুরু হয়ে যায় (Right ventricular hypertrophy)। ই-সি-জি'তে 'পি' তরঙ্গ ('P' wave) স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হয়। তাছাড়া ই-সি-জিতে আমরা মোটামুটি 'কর পালমুনেল' অবস্থার অস্বাভাবিক চিত্র দেখতে পাই (৩৭)।

---

## পঞ্চম পর্ব

**A. অন্যান্য রোগের সঙ্গে হাঁপানির পার্থক্য নির্ণয় :**

হাঁপানি নির্ণয় করা খুব একটা কঠিন সমস্যা নয়। তবে অল্প বয়সী শিশুদের যদি ট্রেকিয়া বা ব্রংকাসে বায়ুচলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রথম অবস্থায় তাকে হাঁপানি বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া শিশু বয়সে শ্বাসনলী খুব সরু থাকে ; যদি কোন কারণে সেখানে শক্ত শ্লেষ্মা জমে, সেই উপসর্গকে হাঁপানি বলে মনে হতে পারে।

মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধদের হৃদরোগের লক্ষণ অনেক সময় হাঁপানির অনুরূপ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর পূর্ব ইতিহাসে হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভের কোন দোষ বা উচ্চ রক্ত চাপের কথা জানা গেলে ঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হতে পারে। এ ছাড়া হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতার ( failure ) জন্য ফুসফুসে জলীয় পদার্থ জমতে পারে এবং কাশির সঙ্গে সেই তরল শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নির্গত হয়। কোন কোন সময়ে তার সঙ্গে রক্তের আভাও দেখা যায়।

ক্রণিক ব্রংকাইটিসের লক্ষণের সঙ্গে কখনও কখনও হাঁপানি রোগের সাদৃশ্য থাকতে পারে। তার কারণ, ক্রণিক ব্রংকাইটিসেও শ্বাস পথে বায়ু চলাচল ব্যাহত হতে পারে। রোগ বীজাণুর আক্রমণে শ্লেষ্মা ঝিল্লি ফুলে ওঠে, বেশী শ্লেষ্মা জমে। ঐ দুই কারণেই বায়ু চলাচলে বাধা আসে ; এখানে হাঁপানি রোগের মত অ্যালার্জিজনিত কোন সমস্যা নেই। তবে এটা মনে রাখা উচিত যে একই রোগীর এক সঙ্গে হাঁপানি ও ক্রণিক ব্রংকাইটিস থাকা সম্ভব।

ক্রণিক ব্রংকাইটিসে অনেক দিন ভুগলে ফুসফুসে এক প্রকার স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে। এর ফলে ফুসফুসের আকার বৃদ্ধিপায়, কোষগুলিও আকারে বড় হয় এবং ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা ( elas icity ) কমে যায়। আকারে বড় হলেও ফুসফুসের কার্য্যক্ষমতা কিন্তু হ্রাস পায়। এই রোগের নাম এমফাইসিমা (Emphysema)। রোগের সূচনায় রোগী ঠিকমত শ্বাসকষ্ট অনুভব করে না, মনে করে এই কষ্ট বোধহয় বেশী পরিশ্রমের জন্য।

কিন্তু শেষের দিকে এই কষ্ট সব সময়ে অনুভূত হয়। এই অবস্থার সঙ্গে হাঁপানির পার্থক্য নির্ণয় করা দরকার। এমফাইসিমা'র হাঁপানি অনেক মাস, অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে বাড়ে. অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গে থাকে ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস। ঠিকভাবে ইতিহাস নিলে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন নয়। তাছাড়া এক্স্-রে করলে ফুসফুসের কোষের মধ্যে হাওয়া বেশী থাকার জন্য ফুসফুস বেশী কালো দেখায়। কর্টিকোস্টেরয়েড বা স্যালবুটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পরে বা শ্বাসপথে 'স্প্রে' করার পরে হাঁপানি রোগে কষ্ট কিছু কমে এবং এফ-ই-ভি ১ ( F E.V.$_1$ ) ও টাইডাল ভল্যুম ( Tidal Volume ) কিছুটা বৃদ্ধি পায়, যেটা এমফাইসিমা রোগে হয় না। পার্থক্য নির্ণয়ে এটিও বড় সহায় (70)।

কয়েকটি সাধারণ রোগের লক্ষণের সঙ্গে হাঁপানির সাদৃশ্য থাকতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রক্তে ইয়োসিনোফিল কোষ বৃদ্ধির জন্য ট্রপিকাল পালমোনারী ইয়োসিনোফিলিয়া ও অ্যাজমাটিক পালমোনারী ইয়োসিনো-ফিলিয়া। এই দুই প্রকার রোগেই হাঁপানি অন্যতম প্রধান লক্ষণ। উভয় রোগেই অল্পবিস্তর কাশি থাকে, সামান্য জ্বরও থাকতে পারে। তবে রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই শ্বেতকণিকার সংখ্যা মাঝারি থেকে খুব বেশি বৃদ্ধি হয়, আর ইয়োসিনোফিল কোষ সাধারণত শতকরা 20টির বেশী থাকে; কোন সময় শতকরা 90টির বেশী হতে পারে। অল্প কয়েক দিনের চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হয় (70)।

আর এক ধরণের হাঁপানি রোগ দেখা যায় শিশুদের মধ্যে বিশেষভাবে তাদেরই যারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা নোংরা বস্তিতে বাস করে। খারাপ পরিবেশে থাকার জন্য এখানের শিশুরা অ্যাসকারিস লুমব্রিকয়ডিস (Ascaris Lumbricoides) কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই কৃমি পেট থেকে ফুসফুসে যায়, কখনও কখনও পালমোনারী ধমণীতে ঢুকে পড়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত করে। রক্ত পরীক্ষায় অল্প সংখ্যায় ইয়োসিনোফিল কোষ বৃদ্ধি ও বুকের এক্স্-রে'তে ফুসফুসে স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক সাদা দাগ দেখা যায় (71)। এদের হাঁপানির সঙ্গে অল্পকাশি ও জ্বর হতে পারে। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনেক সময় এদের যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হয়। রোগীর বাসগৃহের পরিবেশ দেখে অনেকে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কৃমি রোগের চিকিৎসা করে ভাল ফল পেয়েছেন। সাধারণত চিকিৎসার পরে এই শ্রেণীর রোগীদের মলের সঙ্গে কৃমি দেখা যায়।

সিলিকোসিস ও ডিফিউজ ফাইব্রোসিং অ্যালভিয়োলাইটিস রোগ দুটি সাধারণত খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এই দুটি রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হাঁপানি। সিলিকোসিস রোগের লক্ষণ হাঁপানি হলেও, রোগ নির্ণয়ে কোন অসুবিধা হয় না, কারণ রোগী কোথায় কত বছর কাজ করেছে এই তথ্য জেনে নিতে পারলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়ে আসে। তবে, মনে রাখা উচিত, খনিতে অনেক বছর যে কাজ করছে, তার সিলিকোসিস না হয়ে হাঁপানির জন্যও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সঠিক নির্ণয়ের জন্য বুকের এক্স্-রে ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা উচিত।

ডিফিউজ ফাইব্রোসিং অ্যালভিওলাইটিস রোগের সঙ্গে হাঁপানির পার্থক্য নির্ণয় অপেক্ষাকৃত কঠিন। শ্বাসকষ্ট এখানে ধীরে ধীরে বাড়ে। মধ্যে হয়ত জ্বর, কাশি হয়ে পুঁজের মত কফ উঠতে পারে। মধ্যে মধ্যে আঙুল স্থূলাগ্র ( নখ উঁচু—clubbing) হতে দেখা যায়, কখনও জিভে বা ঠোঁটে নীল আভা দেখা যায়। বুকের এক্স্-রে ছবিতে প্রথম অবস্থায় কিছু পাওয়া নাও যেতে পারে ; শেষে যখন সাদা সাদা গোল দাগ (nodular) দেখা যায় তখন রোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তখন হাঁপানির সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় বিশেষ সমস্যা নয়।

যদি কোন কারণে প্লুরার থলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ জমে বা ফুসফুস কোষ ফেটে গিয়ে হাওয়া জমতে থাকে তখন ঐ জলীয় পদার্থ বা জমে থাকা বাতাসের জন্য মেডিয়াস্টাইনাম বিপরীত দিকে সরে যায় (mediastinal shift)। প্লুরার থলির মধ্যে জলীয় পদার্থ নানা কারণে জমতে পারে ; তার দুটি খুব সাধারণ কারণ হোল প্লুরা বা ফুসফুসে যক্ষারোগ বা ক্যানসার জাতীয় রোগ। আর প্লুরার থলির মধ্যে হাওয়া জমতে পারে এমফাইসিমা রোগে ফুসফুসের কোষ ফেটে গিয়ে। এই অবস্থাকে এমফাইসিমা রোগের এক জটিল উপসর্গ বলাই বোধ হয় সঙ্গত।

উভয় রোগেই প্রধান লক্ষণ হাঁপানি। কিন্তু ঠিকভাবে রোগী পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে একদিকের বুকের খাঁচা একেবারেই নড়ছে না, দেখতেও বেশী বড় লাগছে। স্বর-কম্পন খুব কম। মেডিয়াস্টাইনাম বিপরীত দিকে সরে যায়। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে শোনা যাবে যে আক্রান্ত দিকে শ্বাসের কোন আওয়াজ নেই এবং বুকে আঙুল ঠুকে পরীক্ষা করলে পার্থক্য নির্ণয় হবে। যেখানে প্লুরা থলির মধ্যে জলীয় পদার্থ সেখানে অনুরণন হবে নিম্নগ্রামের,

আর যেখানে প্লুরা থলির মধ্যে বাতাস জমেছে, সেখানে উচ্চ অনুরণন শোনা যাবে। বুকের এক্স-রে অবশ্য সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করবে। এই দুই রোগে শ্বাস কষ্ট থাকলেও এই শ্বাসকষ্ট ফুসফুসের রোগের জন্য নয়।

**B. রোগের জটিলতা (Complication) :**

(1) বক্ষ পঞ্জরের বিকৃতি : খুব শিশু অবস্থায় যাদের হাঁপানি হয় তাদের স্টারনাম কিছুটা ভিতর দিকে ঢুকে যায় এবং পাঁজরার নিচের অংশে খাঁজ দেখা দিতে পারে, যার নাম 'হ্যারিসন সাল কাস'। একটু বেশী বয়সের শিশুদের বুকের খাঁচার সামনের অংশ পাখীর বুকের মত উঁচু হয়ে ওঠে।

(2) শিশু বয়স থেকে যারা হাঁপানি রোগে ভোগে তাদের শরীরে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।[72] কর্টিসোন ব্যবহারের আগেও এটা জানা ছিল। আজকাল কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ হাঁপানি চিকিৎসার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে, এর ফলে রোগের তীব্রতা কিছু কম হলেও দীর্ঘকাল কর্টিসোন ব্যবহারে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(3) ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং উপসর্গের জটিলতা বৃদ্ধি করে।[73]

(4) নিউমোনিয়া ও এটিলেক্টেসিস : রোগী বিশেষের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাইটিস জটিল হয়ে নিউমোনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। রক্ত পরীক্ষা ও বুকের এক্স-রে করে এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া হলে শ্বাসনলীতে অধিকমাত্রায় শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় শ্লেষ্মা কঠিন হয়ে ব্রঙ্কিয়োল বা ব্রঙ্কাই-এর নলী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শ্বাসপথ বন্ধ হলে ফুসফুসের বাতাস শোষিত হয় এবং ফুসফুস বায়ুশূন্য ( atelectasis ) হয়ে চুপসে যায়।

(5) স্বতোৎসারিত নিউমোথোরাক্স : সাধারণ হাঁপানি রোগীদের এই জাতীয় জটিলতা দেখা যায় না ; তবে রোগ অনেকদিনের পুরানো হলে এবং সঙ্গে এমফাইসিমা জাতীয় জটিলতা সৃষ্টি হলে এই ধরনের নিউমো-থোরাক্স হতে পারে।

(6) পাঁজরা ভেঙ্গে যাওয়া : হাঁপানির সঙ্গে কাশি হওয়ার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা আঘাতে পঞ্জরাস্থি ভেঙ্গে যেতে পারে। কারণ দুটি : সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার ও এক্সটারনাল অবলিক্ পেশী দুটি পঞ্জরাস্থি-

গুলিকে দুই বিপরীত দিকে টেনে ধরে এবং এই টানের ফলে পঞ্জরাস্থি ভেঙ্গে যেতে পারে। এ ছাড়া কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার জন্য অস্থিতে খনিজ পদার্থ কমে যায়, অস্থি দুর্বল হয় এবং অল্প চাপেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

( ) মেডিয়াস্টাইনাল এমফাইসিমা ঃ কখনো কখনো উচ্চবায়ু চাপের সময় ফুসফুসের দুর্বল অংশ দিয়ে বাতাস মেডিয়াস্টাইনাম-এর ভিতরে প্রবেশ করে। বাতাসের ধর্ম উপরে ওঠার চেষ্টা করা ; সেইমত বাতাস মেডিয়াস্টাইনাম থেকে গ্রীবাদেশের ত্বকের নীচে চলে আসতে পারে। ঐ সময় রোগীর শ্বাসকষ্ট তো থাকেই, তাছাড়া গলার কাছে চাপ সৃষ্টি হয়। চামড়ার উপরে হাত দিয়ে চাপ দিলে এক ধরণের 'পট্ পট্' ( crepitus ) আওয়াজ হাতে অনুভব করা যায়। এই জটিল উপসর্গ প্রধানতঃ শিশুদের মধ্যেই বেশী দেখা যায় (74)।

(8) হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ ঃ হাঁপানিতে মৃত রোগীর শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের কায়বৃদ্ধি ঘটেছে। দক্ষিণ ভেনট্রিকলের পেশী স্বাভাবিকের চেয়ে পুরু দেখায় (75)। হাঁপানির সময় পালমোনারী ধমনীর রক্তচাপ মাপা সম্ভব হয় না ; তবে অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ সময়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেনের অভাবের জন্য ধমনিকা বা ছোট-ধমনীগুলিতে ( Pulmonary arterioles) পেশী সংকোচন হয় বলে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়। পুরানো হাঁপানি রোগীদের হৃৎপিণ্ডে 'কর পালমোনেল' ( Cor-Pulmonale ) জাতীয় পরিবর্তন দেখা যায় এবং ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামে এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে।

### C. পরিনতির পূর্বাভাস (Prognosis) :

হাঁপানি রোগীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রোগীর বয়সের উপর, কোন বয়সে প্রথম রোগ দেখা দিয়েছিল, হাঁপানিগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে বিরতি আছে, না হাঁপানি বিরামহীন, ইত্যাদির উপর। তা ছাড়া আছে ব্রংকাইটিসের সহাবস্থান - যা রোগীর ভবিষ্যতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

অগিলভি সব বয়সের 1000 হাঁপানি রোগীর উপর (73) এক বছর ধরে লক্ষ্য রেখে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশু বয়সে যাদের হাঁপানি দেখা যায় তাদের ভবিষ্যত খারাপ নয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রোগ লক্ষণগুলি উপশম হতে থাকে। বেশ কয়েক বছর অনুসন্ধান করে তিনি দেখেছেন যে যাদের হাঁপানির আক্রমণের মধ্যে

বিরতি থাকে তাদের মধ্যে শতকরা 65 জনের আক্রমণ খুব সামান্য অথবা হয় না বললেই চলে। আর যাদের হাঁপানিতে ছেদ নেই, বিরামহীন একটানা চলতে থাকে, তাদের মধ্যে সেই হার শতকরা 37।

আগেই বলা হয়েছে, ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানি রোগীর ভবিষ্যৎ বহুলাংশে প্রভাবিত করে। যাদের বিরামহীন হাঁপানি হয় তাদের মধ্যে অনেকেরই ব্রঙ্কাইটিসও থাকে। মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধদের লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে যাদের ব্রঙ্কাইটিস নেই তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র [illegible] জনের পরবর্তী জীবনে হাঁপানির আক্রমণ হয়েছে; অপরদিকে যাদের ব্রঙ্কাইটিস আছে তাদের মধ্যে শতকরা 30 জন শেষ জীবনে হাঁপানির শিকার হয়েছেন।

তবে অবিরাম তীব্র হাঁপানি বা স্টাটাস অ্যাজমাটিকাস জাতীয় গুরুতর অবস্থায় এখনও বহু রোগীর মৃত্যু হয়, শতকরা প্রায় 9 জন; অপরদিকে হাঁপানি আক্রমণের অন্তবর্তী কালে যাদের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা মাত্র 2।

কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ হাঁপানি রোগীদের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট আশাপ্রদ করেছে। আরও কিছু কিছু নতুন ওষুধের আবিষ্কার ও সেই সম্পর্কিত গবেষণা এদের একদা হতাশাহত জীবনে স্বস্তি ও শান্তির প্রলেপ যোগাবে এমন সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই সুপরিস্ফুট। এমন কি ষ্টাটাস অ্যাজমাটিকাসে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুহার আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে; সময় মত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে এই হার আরও হ্রাস পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব।

---

# ষষ্ঠ পর্ব

চিকিৎসা :

হাঁপানির কারণ যেমন বহুবিধ, তেমনি চিকিৎসারও বাঁধা ধরা কোন পথ নেই। এক ধরনের ওষুধ একের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও অপরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া সম্ভব। একথাও ঠিক যে হাঁপানিতে আক্রান্ত সব রোগীর পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়—যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা উপশম করা যায়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে হাঁপানির আক্রমণ বন্ধ হয়, আবার অনেকের বিশেষ কোন একটি ওষুধ ব্যবহারে রোগ উপশম হয়। তার অর্থ এই নয় যে এদের আর কখনও হাঁপানি হবে না। আসলে হাঁপানি রোগী বসে থাকে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির উপর, যে-পাহাড় যে কোন সময় জেগে উঠতে পারে। তেমনি আপাতসুস্থ হাঁপানি রোগীর যদি উত্তেজনা সৃষ্টির কোন কারণ ঘটে, তা অ্যালার্জি বা রোগ বীজাণুর আক্রমণ বা মানসিক সংঘাত ইত্যাদি যাই হোক না কেন, রোগের পুনরাক্রমণ শুরু করতে পারে।

বর্তমানে হাঁপানি রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের হাতে অনেক ভাল ওষুধ এসেছে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোনটি ভাল কাজ করবে সেইটি বেছে নিয়ে ধৈর্য ধরে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। উদ্দেশ্য একটাই রোগীকে যতটা সম্ভব সুস্থ রেখে কাজের উপযোগী করে রাখা। এই সব রোগীকে চিকিৎসার জন্য ওষুধ ছাড়া যেটি বিশেষ দরকার তা হোল চিকিৎসকের ধৈর্য ও রোগীর প্রতি সহানুভূতি। চিকিৎসক যদি রোগীর আস্থা অর্জন করতে পারেন, সেই বিশ্বাস ওষুধের চেয়ে বেশী কার্যকর হবে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, সংবেদনশীল লোকের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বা শ্বাসপথে বীজাণু আক্রমণ বা মানসিক সংঘাতে অথবা সম্মিলিতভাবে উপরি উক্ত কারণগুলি শ্বাসপথে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে হাঁপানি সৃষ্টি হয়। এই সময় শ্বাসনলীর পেশী সংকোচন শ্লেষ্মা ঝিল্লীর প্রদাহ ও তজ্জনিত অধিকতর শ্লেষ্মা ক্ষরণ হতে থাকে এবং শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে অন্তরায় ঘটে প্রতিটি বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে কি কারণে শ্বাসপথের শ্লেষ্মাঝিল্লী

উত্তেজিত হয়েছে সেটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দরকার। অর্থাৎ বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে রোগীর জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক বিশদভাবে বুঝতে হবে এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

1. অ্যালার্জি : অ্যালার্জি যে বহির্জাত হাঁপানির অন্যতম প্রধান কারণ এ বিষয়ে আজ আর দ্বিমত নেই। তবে যেহেতু অ্যালার্জির পরিধি বিশাল, তাকে খুঁজে বার করা বেশ কঠিন কাজ। আমাদের পরিবেশের সর্বত্রই এ্যালার্জেন ছড়িয়ে আছে ; তার মধ্যে কে দোষী খুঁজে বার করতে চিকিৎসককে রীতিমত ডিটেকটিভের কাজ করতে হবে। অনেক লোকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দোষীকে খুঁজে বার করতে ডিটেকটিভ যে ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এখানেও সব কিছু খুঁজে দেখে তাই করতে হবে। রোগীর ইতিহাস নিতে হবে বিশদভাবে ; ঠিক ভাবে প্রশ্ন করে উত্তর পেলে দোষী অ্যালার্জেনটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এর পরে আছে অ্যালার্জেন পরীক্ষা ; এর দ্বারা হয়ত বিশেষ একটি বা দুটি অ্যালার্জেনের প্রতি দৃষ্টি পড়বে এবং রোগীকে বলা যেতে পারে সম্ভব হলে ঐ অ্যালার্জেনের সংস্পর্শ যেন তিনি এড়িয়ে চলেন। এই কাজ হয়তো বহুক্ষেত্রে সম্ভব হবে না, তবে কোন খাদ্যবস্তু বা পশু-পাখীর মলে কারও অ্যালার্জি থাকলে সেটা এড়িয়ে চলা সম্ভব হতে পারে।

এই জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে একটা নিয়ম মেনে চলা উচিত এবং চিকিৎসকের উচিত প্রশ্নপত্র তৈরী করা। রোগীকে নিত্য-দিনপঞ্জী রাখতে বলতে হবে ; তাতে তাঁর দৈনন্দিন কাজ, কখন হাঁপানি হয়, তখন ঘরে কি করা হচ্ছিল ; যদি ঘরে না হয়ে বাইরে হয় তখন আবহাওয়া কেমন ছিল ; কোন গৃহপালিত পশু-পাখী বা পতঙ্গের সংস্পর্শে আসার পর হাঁপানি আক্রমণ হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নিয়মিত ভাবে এই দিনপঞ্জীতে তিনি লিখে রাখবেন। রোজ কি কি খাবার খেয়েছেন তাঁর খুঁটিনাটি বিশদভাবে লিখতে হবে। এই দিনপঞ্জী ধরে চিকিৎসক রোগীকে প্রশ্ন করবেন এবং আরও গভীরে প্রবেশ করে কি ধরনের অ্যালার্জেন তাঁর হাঁপানির কারণ হতে পারে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এরপরে চিকিৎসককে ভাবতে হবে কি ভাবে রোগীকে অ্যালার্জেনমুক্ত পরিবেশে রাখা সম্ভব হতে পারে। হাঁপানি রোগীদের শয়নঘর ও পড়ার ঘরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অনেক রোগীর রাত্রে হাঁপানির জন্য ঘুম ভেঙ্গে যায়। এঁদের ক্ষেত্রে হয়ত বিছানা-বালিশে নিহিত অ্যালার্জেন হাঁপানি সৃষ্টি করেছে। যাদের সামর্থ আছে তাদের তুলোর বিছানা বদলে ফোম বা

রবারের গদি-বালিশ ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের সেরূপ আর্থিক সঙ্গতি যেহেতু নেই, সেইজন্য তাদের বিছানা বালিশ ঘরের বাইরে নিয়ে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। যাঁরা পারবেন তাঁরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে গদি ও ঘরের ময়লা পরিষ্কার করবেন। তারপরে গদিটি প্লাস্টিক বা পলিথিন আস্তরণ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে যাতে বিছানা ব্যবহার করার সময়ে ধুলো না উড়তে পারে।

বিছানা ছাড়া ঘরের অন্য যে সব জায়গায় ধুলো জমে তার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। মেঝেতে কোন কারপেট থাকবে না ; ঘরের আসবাব যেটুকু না থাকলে নয় অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশী একেবারেই নয়। আলমারির পিছন ও আলমারির উপরে ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে যাতে ধুলো না ছড়িয়ে পড়ে। মেঝেতে ঝাঁটা দেবার সময় রোগীকে ঘরের বাইরে এনে ঝাঁট দেওয়া উচিত, অন্যথায় ভিজে কাপড়ে মেঝে মুছে নিতে হবে। ঘর পরিষ্কার করার সময়ে প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে বিছানা ঢেকে দিতে হবে যাতে বিছানায় ধুলো না ঢুকতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি কিন্তু একেবারেই উপেক্ষা করার মত নয়। বর্তমান নিবন্ধ লেখক এই পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছেন।

অ্যালার্জেন পরীক্ষা দ্বারা দোষী অ্যালার্জেন খুঁজে পাওয়া গেলেও তার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলা সব সময় সম্ভব হয় না, যেমন পোলেন রেণু। সেক্ষেত্রে সেই অ্যালার্জেনের প্রতি রোগীর সংবেদনশীলতা কমানোর চেষ্টা করা উচিত। খুব অল্প মাত্রায় অ্যালার্জেন ইনজেকসন দিয়ে সংবেদনশীলতা কমানো যে সম্ভব এ কথা কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের বক্তব্য হোল এই যে, অল্প যে-কয়জন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে, তার সারবত্তা নেই এই কারণে যে হাঁপানি রোগীদের যে কোন প্রকারের নতুন কিছু ওষুধ দিলেই কিছুদিনের জন্য হাঁপানি কমতে পারে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শুধু স্যালাইন ইনজেকসন দিয়েও হাঁপানি কম হতে দেখা গিয়েছে।

এইসব বিতর্কে না গিয়ে দেশে-বিদেশে কিছু বিজ্ঞানী অ্যালার্জেনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমানর উদ্দেশ্যে যে সব প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন সেই আলোচনা অনেক বেশী সার্থক হবে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ গবেষণা করে দেখেছেন যে পোলেন রেণু ও ঘরের ধুলোর মধ্যে 'মাইট' ( Mite ) এই দুই শ্রেণীর অ্যালার্জেনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমানোর চেষ্টায় কিছুটা সুফলও

পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রফ্‌টন ও ডগ্‌লাস 'মাইট' অ্যান্টিজেন পরিক্ষায় হতাশ হয়েছেন।

পোলেন অ্যান্টিজেনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমাবার জন্য ইনজেকসন দেওয়া হয় খুব অল্প মাত্রায়। মৌলিক মাত্রাকে বলা হয় 'নুন ইউনিট' ইনজেকসনে অ্যালার্জেনের মাত্রা খুবই কম থাকে, যেমন 1 গ্রাম পোলনের 10,000,000 ভাগ তরল করে 1 মিলিলিটার মাত্রায় ইনজেকসন দেওয়া হয়। ইউনিটের নামকরণ হয়েছে ডাঃ নুনে'র নামে। তরলীকৃত অ্যান্টিজেন কম মাত্রায় প্রয়োগ করলে সেই বিশেষ অ্যান্টিজেনের সংবেদশীলতা যে কমে আসবে এই মতবাদের পথিকৃত হলেন নুন। অতীতে তরলীকরণ করা হোত জল মিশিয়ে। তার অসুবিধা হোল এই যে অ্যান্টিজেন বেশী সময় শরীরে থাকেনা ; সেইজন্য অনেকগুলি ইনজেকসন দিতে হয়। আজকাল অ্যান্টিজেনকে তৈলজাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা ফিটকারীতে থিতানো অবস্থায় ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অ্যান্টিজেন দেহে সঞ্চিত থেকে ধীরে ধীরে দেহকোষের তরল পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী ইনজেকসনের সময় ধীরে ধীরে অ্যান্টিজেনের মাত্রা বাড়ান হয়। কোন রোগীর কতগুলি ইনজেকসন লাগবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোন রোগীর হয়ত প্রতি বছর অ্যালার্জেন ইনজেকসন দিতে হচ্ছে ; আবার অন্যের হয়তো উপকার হওয়ার পর আর দরকার হোল না।

**প্রতিক্রিয়া ঃ** ইনজেকসন দেওয়ার 2 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে অ্যানাফিল্যাক্‌সিস ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইনজেকসনের জায়গায় স্থানীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

ইনজেকসন দেওয়ার আগে একটি হিস্‌টামিন-বিরোধী বড়ি খাওয়াতে হবে। চার ঘন্টা পরে আর একটি বড়ি দরকার হতে পারে এবং সেটি রোগীর কাছে রাখা দরকার।

শ্বাসপথে অ্যালার্জেন স্প্রে করেও সংবেদনশীলতা কমাবার চেষ্টা হয়েছে। ম্যাকএলেন ঘরের ধুলো খুব কম মাত্রায় নরম্যাল স্যালাইনের সঙ্গে মিশিয়ে শ্বাসপথে স্প্রে করে এই চেষ্টা করেছেন।

প্রতি সপ্তাহে ধুলোর মাত্রা ৩০ ভাগ করে বাড়ান হয়। কিন্তু ধুলো ও পোলেন ছাড়া অন্য অ্যালার্জেনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি ; উপরন্তু এই ধরনের চিকিৎসায় বিপদের সম্ভবনা আছে।

2. শ্বাসপথে বীজাণু আক্রমণ :

শ্বাসপথে বীজাণু আক্রমণ কোন না কোন সময়ে সকলেরই হয়। কিন্তু সকলের তো হাঁপানি হয় না ; হয় তাদেরই যাদের আগে থেকে হাঁপানি প্রবণতা আছে। শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে অল্প বাধা আগে থেকেই ছিল, রোগী হয়তো বা এই ব্যাপারে অবহিত ছিল না। বীজাণু সংক্রমণের ফলে শ্লেষ্মা ঝিল্লী ফুলে ওঠে এবং বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয় ; ফলে শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে বাধা আরও বৃদ্ধি পায়, আর তখনই রোগী হাঁপানির কষ্ট অনুভব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বীজাণু বা ভাইরাসের পূর্ব আক্রমণে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি নতুন বীজাণুর অ্যান্টিজেনের সঙ্গে মিশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ফলেও শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে প্রদাহ হতে পারে।

শ্বাসপথে বীজাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করে রোগীকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করা যায় দীর্ঘদিন টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করে। এর সঙ্গে বিশেষ ক্ষেত্রে খুব অল্প মাত্রায় প্রেড্‌নিসোলোন ( 2·5 – 5·0 মিলিগ্রাম ) দিনে 2 বা 3 বার দিয়ে অ্যান্টিজেন—অ্যান্টিবডি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘদিন বিবেচনামত এই দুটি ওষুধ ব্যবহার করে বহু ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

তবে আজকাল রোগীদের নিজে থেকে অনিয়মিত ভাবে ও কম মাত্রায় ওষুধ খাওয়ার প্রবণতার জন্য কয়েক প্রকার বীজাণু ওষুধ প্রতিরোধী শক্তি অর্জন করেছে। তাছাড়া কোন কোন রোগীর শ্বাসপথে (বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের) স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস বা অ্যালবাস শ্রেণীর বীজাণু আক্রমণ হতে পারে। এই শ্রেণীর রোগীদের বেলায় টেট্রাসাইক্লিন ব্যর্থ হতে পারে, সেইজন্য যে সব ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায় না, সেই রোগীদের কফ্‌ কালচার করে—কফের বীজাণু চরিত্র এবং বিভিন্ন ওষুধের প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে, সেইমত ওষুধ ব্যবহারই বিধেয় ; তাতে সুফলও বেশী পাওয়া যাচ্ছে।

স্টাফাইলোকক্কাস প্রজাতির বীজাণু সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য ক্লক্‌সা-সিলিন ক্যাপসুল 250 মিলিগ্রাম দিনে চারবার খাওয়ান যেতে পারে। যদি খুব গুরুতর ধরনের বীজাণু আক্রমণ হয় সেক্ষেত্রে 250 মিলিগ্রাম দিনে তিন বা চারবার পেশীর মধ্যে ইনজেকসন দেওয়া যেতে পারে। ক্লকসাসিলিন-এর পরিবর্তে মেথিসিলিন 1 গ্রাম মাত্রায় দিনে চারবার পেশীর মধ্যে ইনজেকসন

দেওয়া চলে। মেথিসিলিন পাকস্থলীর রসে নষ্ট হয়ে যায়—সেইজন্য খাওয়ালে কোন কাজ হয় না।

আজকাল শ্বাসযন্ত্রে বীজাণু সংক্রমণে অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়; কখনও কখনও একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে ব্যবহার হয়। এগুলি ব্যবহারের সময় ঐ শ্রেণীর ওষুধগুলি সমধর্মী কিনা, অথবা এক শ্রেণীর ওষুধ অপর এক শ্রেণীর ওষুধের কাজে প্রতিবন্ধক হবে কিনা তা ভাল ভাবে জেনে তবেই ব্যবহার করা উচিত। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, স্টাটাস অ্যাজমাটিকাস রোগীদের শিরার মধ্যে গ্লুকোজ স্যালাইন বা অন্যান্য শ্রেণীর জলীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। সেই টিউবেই কার্বেনিসিলিন ও জেন্টামাইসিন ব্যবহার করা হোত। পরে জানা গিয়েছে, কার্বেনিসিলিন ও জেন্টামাইসিন একই টিউবে ইনজেকসন দিলে, জেন্টামাইসিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য এত বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক আজ আমরা পেয়েছি. যাদের ব্যবহারবিধি সম্যক না জেনে ব্যবহার করলে ফল খারাপ হতে পারে।

### 3 মানসিক কারণে হাঁপানি :

কেবলমাত্র মানসিক রোগের জন্য হাঁপানি হতে দেখা যায় না বটে, তবে যাদের হাঁপানি আছে, মানসিক চাপ ও সংঘাত তাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে, বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বিভিন্ন বয়সে মানসিকতার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। কোন শিশু হয়ত বাড়ীর পরিবেশ পছন্দ করে না; তার যদি আগে থেকে হাঁপানি থাকে, সেই বিরূপ পরিবেশে হাঁপানি আরও বেড়ে যেতে পারে। শিশুরা বাবা-মা'র কলহ পছন্দ করে না; তাতেও হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে এই ব্যবহারের প্রতিবাদ হিসাবে। পরীক্ষার মুখে, হয়তো মানসিক উদ্বেগে হাঁপানি হতে দেখেছি; পরীক্ষা দিতে হল না, হাঁপানি সেরে গেল প্রায় বিনা চিকিৎসায়।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে উত্তেজনা, অভিমান, পারিবারিক কলহ ও মনোমালিন্যের জন্য অনেক সময় হাঁপানি হতে দেখা যায়। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে হাঁপানিও সেরে যায়।

হাঁপানির সঙ্গে মানসিক অবস্থার সম্পর্কটি রোগীকে খোলাখুলি বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। গোলাপ ফুল শুঁকে যাঁর হাঁপানি হয়েছিল মৃদু আলোতে প্লাষ্টিকের গোলাপ

শংকে তাঁর হাঁপানি হওয়ার উদাহরণ আগেই বলা হয়েছে। কার্যকারণটি বুঝিয়ে বলার পর আসল গোলাপ শংকেও তার আর কখনো হাঁপানি হয় নি।

আজকাল মানসিক চাপে যাদের হাঁপানি হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের সম্মোহন ( Hypnotism ) করে হাঁপানি সারাবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে এই পদ্ধতি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে।

হাঁপানি রোগীর চিকিৎসার জন্য যে নীতি বর্তমানে অনুসরণ করা হয়, তা হোল—

1. ব্রঙকাস ও ব্রঙ্কিয়োল-এর পেশী শিথিল রেখে শ্বাসনলীর ব্যাস বড় ( অর্থাৎ স্বাভাবিক ) রাখা।

2. শ্বাসপথে বীজাণু সংক্রমণ যথাসম্ভব রোধ করা ; যদি আক্রমণ হয়, খুব তাড়াতাড়ি তার চিকিৎসা আরম্ভ করা।

3. অ্যালার্জেন যেন শ্বাসপথের কোন ক্ষতি না করতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা এবং

4. বেশী পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ যাতে না হয় সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এই লক্ষ্যে সফল হতে গেলে যে সব ওষুধ ব্যবহার করতে হবে এবং যে বিধান মেনে চলতে হবে তাকে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করতে পারি :

1. ব্রঙকাসের পেশী শিথিল রাখার জন্য দুই শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার করা হয় ; (a) সিমপ্যাথোমাইমেটিক স্নায়ু উত্তেজক ওষুধ ( Sympathomimetic drugs ) ও (b) থিওফাইলিন জাতীয় ওষুধ ( Theophyline derivative drugs )।

2. বীজাণু ও ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শ্বাসযন্ত্রকে রক্ষা করতে খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনমত অ্যান্টিবায়োটিক ও বীজাণু ধ্বংসী ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে যাতে রোগ শ্বাস পথের গভীরে না যেতে পারে।

3. অ্যালার্জেনবাহী পোলেন, মাইট বহনকারী ঘরের ধুলো, বিশেষ ধরনের খাদ্য ও আবহাওয়ার গুরুতর তারতম্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। ডাই সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ( Di-sodium Chromoglycate ) ব্যবহার করে মাস্ট্ কোষ থেকে হিস্টামিন ও অনুরূপ পদার্থ বেরিয়ে আসা বন্ধ করতে হবে। বিশেষ অ্যালার্জেনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমানর

চিকিৎসা করতে হবে ( Hyposensitization )। প্রয়োজনে কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

4. শ্বাসপথে শ্লেষ্মাক্ষরণ কমানর জন্য ধুলো-ধোঁয়া থেকে দূরে থাকা ও ধূমপানে বিরত থাকা উচিত।

**সিমপ্যাথোমাইমেটিক স্নায়ু উত্তেজক :**

এই ওষুধগুলি দেহের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা অ্যাড্রিনার্জিক * গ্রাহকযন্ত্রের ( Adrenergic receptor ) উপরে কাজ করে। এগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—'$\sigma$' এবং '$\beta$'। '$\beta$' রিসেপটরকে সম্প্রতি আবার দুটি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে—'$\beta_1$, এবং '$\beta_2$'। '$\beta_1$' রিসেপ্টর উত্তেজিত হলে হৃৎপিণ্ডের পেশী উত্তেজিত হয়, অতি দ্রুত স্পন্দন হতে থাকে, ফলে অধিক পরিমাণ রক্ত নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু '$\beta_2$' রিসেপ্টর উত্তেজিত হলে শ্বাসনলীর পেশী শিথিল হয় এবং শ্বাসপথে বায়ুচলাচল সহজ হয়। যদি '$\sigma$' রিসেপ্টর উত্তেজিত হয় তখন প্রান্তীয় ধমনীগুলি সংকুচিত হয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য '$\sigma$' ও '$\beta_1$' রিসেপ্টর সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু-উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগে শ্বাসনলীর পেশী শিথিল করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও কিছু অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—যেমন, ফুসফুসের কৌশিকজালিকার ( capillary ) মধ্যে বেশী পরিমাণে রক্ত আসে, ফুসফুসের বায়ুথলি ও রক্তজালিকার মধ্যে স্বাভাবিক গ্যাস বিনিময় আরও ব্যাহত হয় এবং যে-রোগী অকসিজেনের অভাবে পীড়িত তার কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়।

**অ্যাড্রিন্যালিন :** ( 1 : 1,000 সলিউশন ) ত্বকের নীচে 0.2—0.5 মিলিলিটার মাত্রায় ইনজেকসন দিলে অথবা 1 : 100 তরল পদার্থ শ্বাসপথে এরোসল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে বায়ুচলাচল সহজ হয় বটে কিন্তু '$\beta_1$' রিসেপ্টর ও '$\sigma$' রিসেপ্টরের উত্তেজনার জন্য উপরি উক্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

**আইসোপ্রেনালিন :** অপর এক কার্যকর ওষুধ যা শ্বাসপথে বায়ুচলাচল সুগম করতে পারে। এই শ্রেণীর ওষুধ অ্যাড্রিন্যালিন-এর মত '$\sigma$' রিসেপটরের উপরে কাজ করে না বটে, তবে, '$\beta_1$' ও '$\beta_2$ উভয় রিসেপ্টরের উপরেই কাজ করে। '$\beta_1$' রিসেপ্টর উত্তেজিত হওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ড

* Adrenergic—সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী

উত্তেজিত হয় এবং অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ধমনীর রক্তে অকসিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এই প্রতিক্রিয়া বেশী দেখা যায় যখন 10 মিলিগ্রাম বড়ি চুষে বা চিবিয়ে খাওয়া হয়।

আইসোপ্রেনালিন তরল অবস্থায় স্প্রে হিসাবে বা চাপযুক্ত এরোসল হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। উচ্চচাপে থাকার জন্য জলীয় কণাগুলি শ্বাসপথের গভীরে এমন কি শেষ পর্যায়ে অ্যালভিওলাই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে রোগী একবার বা দু'বার স্প্রে নেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ফল না পাওয়ায় অধৈর্য হয়ে যদি আরও বেশী বার এরোসল স্প্রে নিতে থাকে, তার জন্য অনেক সময় মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। পরবর্তী কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যখন এই কুফল বুঝতে পারলেন তখন প্রতি এরোসল যন্ত্রের উপর ব্যবহার বিধিতে সাবধানী নির্দেশ লিখে দেওয়া হল এবং তারপর থেকে মৃত্যুহার কমে গিয়েছে। তাছাড়া অ্যাড্রিন্যালিন ও আইসোপ্রেনালিনের কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী। অ্যাট্রোপিন মনোনাইট্রেটের সঙ্গে একযোগে ব্যবহার করলে এদের কার্যকাল বৃদ্ধি পায় বটে, তবে অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য এই দুই শ্রেণীর ওষুধ আজকাল হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার প্রায় হয় না বললেই চলে।

বস্তুতপক্ষে হাঁপানি রোগীদের জন্য এমন ওষুধ দরকার যা কেবলমাত্র ব্রঙ্কাই পেশীর '$\beta_2$' রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে এবং '$\beta_1$' এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না অথবা যদিও করে, তা যেন খুবই মৃদু ধরনের হয়। সম্প্রতি সেই ধরনের কিছু ওষুধ চালু হয়েছে।

**অরসিপ্রেনালিন ও স্যালবুটামল :** এই জাতীয় ওষুধ শুধু '$\beta_2$' রিসেপ্টরের মাধ্যমে ব্রঙ্কাই পেশীকে শিথিল করে, হৃৎপিণ্ডের উপর কোন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হয় না বললেই চলে (চিত্র—14)। এরা রক্তে অকসিজেন কমায় না (অ্যাড্রিনালিন বা আইসোপ্রেনালিন ব্যবহার করলে যা হয়ে থাকে)। তাছাড়া এদের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী। অরসিপ্রেনালিন ও স্যালবুটামল নানাভাবে ব্যবহার করা চলে। দুটি ওষুধই চাপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা এরোসল হিসাবে শ্বাসপথে ব্যবহার হয়। দুবার এরোসল যন্ত্রে চাপ দিয়ে শ্বাস নিলে 1500 m.c g. অরসিপ্রেনালিন শ্বাসপথে প্রবেশ করে। একইভাবে স্যালবুটামল ব্যবহার করলে শ্বাস পথে যাবে 200 m cg. মাত্রা ওষুধ। অরসিপ্রেনালিন 10 বা 20 মিলিগ্রাম বড়ি এবং স্যালবুটামল 2 বা 4 মিলিগ্রাম
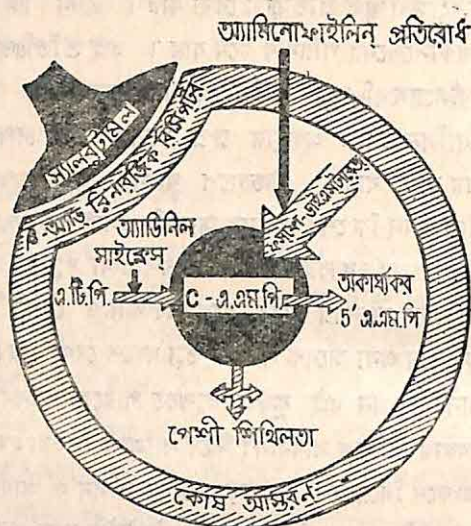
চিত্র—14

বড়ি রূপেও খাওয়ান যেতে পারে। স্যালবুটামল 50) m.cg. মাত্রায় ত্বকের নীচে, পেশীর মধ্যে বা শিরাপথে ইনজেকসন দেওয়া যেতে পারে। এদের কার্যকারিতা 4-5 ঘন্টার কম নয়, বেশীও হতে পারে।

অরসিপ্রেনালিন ও স্যালবুটামল ছাড়া আর একটি ওষুধ বেশ কয়েক-বছর আগে থেকে ব্যবহার হচ্ছে; তার নাম **মেটাপ্রোটিরেনল সালফেট** ( Metaproterenol sulfate )। এই ওষুধটি দুভাবে ব্যবহার হয়—20 মিলিগ্রাম বড়ি হিসাবে এবং এরোসল স্প্রে হিসাবে। প্রতিবার চাপ দিলে 0·65 মিলিগ্রাম তরল ওষুধ অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে শ্বাসপথে যায়।

আর একটি ওষুধ সম্প্রতি আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে, তার নাম **টারবুটালিন**। এটি 2 5 ও 5 মিলিগ্রাম বড়ি আকারে পাওয়া যায়। আরম্ভ করা হয় 2·5 মিলিগ্রাম মাত্রায় দুই বা তিনবার করে, পরে মাত্রা বৃদ্ধি করা চলে যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। অতি সম্প্রতি চালু হয়েছে **আইসোইথেরিন হাইড্রোক্লোরাইড** ( soetharine hydrochloride ) 1%। এটি এরোসল পদ্ধতিতে শ্বাসপথে ব্যবহার করা চলে; দিনের মধ্যে চারবারের বেশী ব্যবহার না করাই ভাল। তবে এই ওষুধটি এখনও এদেশে পাওয়া যায় না।

উপরে যে ওষুধগুলির কথা বলা হোল সবগুলিই কেবলমাত্র '$\beta_2$' রিসেপটরের উপর কাজ করে। সেইজন্য '$\beta_1$' রিসেপটর উত্তেজনা জনিত প্রতিক্রিয়া যা আমরা হৃৎপিণ্ডে দেখতে পাই, সেইরূপ প্রতিক্রিয়া ওই সব ওষুধে হয় না। তবে ঐ ওষুধ সেবনের পর কিছু রোগীর ক্ষেত্রে আঙ্গুল কাঁপতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেটা মারাত্মক কিছু নয়, উপেক্ষা করা যেতে পারে।

কোন কোন দুরন্ত হাঁপানি রোগীকে স্যালবুটামল 0·5% সলিউশন 40% অকসিজেনের সঙ্গে পজিটিভ চাপে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল কাজ পাওয়া যায় ( Intermittent positive pressure breathing )। একইভাবে আইসোইথেরিন হাইড্রোক্লোরাইড নরম্যান স্যালাইনে মিশিয়ে আরও তরল করে তার সঙ্গে অকসিজেন মিশিয়ে পজিটিভ চাপে ব্যবহার করা যায়।

**এফিড্রিন** : সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজক শ্রেণীর সবচেয়ে পুরাতন ওষুধ। চীনদেশে 5000 বছর আগে এই ওষুধ ব্যবহার হত; তখন অবশ্য ব্যবহার হত কয়েক প্রকার গাছের পাতার রস হিসাবে। পরে 1924 সালে প্রথম হাঁপানি রোগের জন্য এফিড্রিন ব্যবহার করা হয়। যতদিন পৃথক ভাবে উন্নততর রূপে ওষুধটি পাওয়া যায় নি গাছের পাতার রসই ছিল হাঁপানি রোগীর একমাত্র সম্বল। এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান এই ওষুধ তৈরী করেন, যা আমাদের কাছে আসে শুদ্ধ এফিড্রিন বড়ি আকারে অথবা অন্য কয়েকপ্রকার ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে। এই ওষুধ অনেকক্ষেত্রেই ফলপ্রদ। তবে অনেক সময় এই ওষুধে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে; বয়স্ক রোগীদের প্রস্রাব করতে অসুবিধা বোধ হয়। তা ছাড়া কিছুদিন ব্যবহার করার পর এর কার্যকরী ক্ষমতা কমে যায়। অ্যাড্রিন্যালিন ও আইসোপ্রেনালিনের সঙ্গে যদি এফিড্রিন ব্যবহার করা করা হয়, তার ফল মারাত্মক হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এফিড্রিন কম মাত্রায় (1— বছর— 5 মিলিগ্রাম ; 6—12 বছর-30 মিলিগ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুদের এফিড্রিন সাধারণত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না।

**থিয়োফাইলিন জাতীয় ওষুধ** : এই জাতীয় ওষুধ সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজক শ্রেণীর থেকে আলাদা। এদের কাজ বহুমুখী ; এরা মেডালাতে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ওপর উত্তেজক চাপ সৃষ্টি করে, করোনারী ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ব্রঙকাই পেশীকে শিথিল করে।

এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায়ে—মুখ দিয়ে খাইয়ে, শিরায় ইনজেকসন দিয়ে এবং মলদ্বারে সাপোজিটারী হিসাবে। অ্যামাইনোফাইলিন ( 250—500 মিলিগ্রাম ) শিরার মধ্যে ধীরে ধীরে ইনজেকসন দিলে রোগীর কষ্ট খুব তাড়াতাড়ি উপশম হয়। তবে অ্যামাইনোফাইলিন ব্যবহারে রোগীর কষ্টের উপশম হওয়া সত্ত্বেও রক্তে অকসিজেনের মাত্রা কমে যেতে পারে। সেইজন্য গুরুতর অসুস্থ রোগীদের শতকরা 28—35 ভাগ অকসিজেন মাস্ক দিয়ে ব্যবহার করলে সেই সম্ভাবনা দূর হয়।

বিদেশে আজকাল একধরনের থিওফাইলিন ক্যাপসুল ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি ক্যাপসুলে 300 মিলিগ্রাম মাত্রায় অ্যাম্যইনোফাইলিন থাকে এবং তা ধীরে ধীরে ক্যাপসুল থেকে মুক্তি পায় ও রক্তে পেঁছায়। এটি দিনে মাত্র দু'বার খেলে ঠিকমত কাজ হয়।

অ্যামাইনোফাইলিন অনেকে খেয়ে সহ্য করতে পারে না; ক্ষারধর্মী ( Alkaline ) প্রকৃতির জন্য বমি ও পেটে ব্যথা হতে পারে। এই অসুবিধা দূর করতে থিওফাইলিনের সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত করে পি-এইচ (pH) কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কোলিন থিওফাইলিনেট এমনি এক যৌগিক পদার্থ যেটি পাকস্থলী পার হয়ে রক্তে পেঁছোবার পরে থিয়োফাইলিন হিসাবে কাজ করে। **প্রকসিফাইলিন** বোধহয় সব ধরনের থিয়োফাইলিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটির মাত্রা হোল 300 মিলিগ্রাম করে 24 ঘন্টায় 3 বার। তবে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজক ওষুধের চেয়ে এদের কার্যকারিতা অনেক কম।

**কর্টিসোন :** হাঁপানি রোগীদের চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে ১৯৫২-৫৩ সালে কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের পরে। অনেক রোগী এখন সুস্থ লোকের মত নিজের কাজ করতে পারছেন; মৃত্যুহার অনেক কমেছে, সবচেয়ে বড়কথা রোগী নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা ফিরে পেয়েছেম।

কর্টিসোন নানাভাবে দেওয়া চলে; বড়ি, ইনজেকসন ও এরোসল স্প্রে। বড়ি নানা শ্রেণীর—যেমন প্রেডনিসোন, প্রেডনিসোলোন, বিটামেথাসোন, ডেক্সামেথাসোন, ট্রাইঅ্যামসিনোলোন ইত্যাদি। জরুরী অবস্থায় রোগীর প্রয়োজন অনুসারে প্রেডনিসোলোন 60 মিলিগ্রাম 24 ঘন্টায় দেওয়া যেতে পারে; পরে রোগীর সুস্থতার উপর দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে প্রেডনিসোলোন-এর মাত্রা কম করা হয়। অন্য শ্রেণীর কর্টিসোন একইভাবে দেওয়া হয় এবং মাত্রা একই ভাবে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়।

ইনজেকসন দেওয়া হয় কেবল গুরুতর অবিরাম হাঁপানিতে আক্রান্ত রোগীদের। যখন ফেটা ফেলা বা ড্রিপ-পদ্ধতিতে শিরাপথে গ্লুকোজ ইনজেকসন দেওয়া হয়, তখন ঐ বোতলে অথবা শিরায় 4-8 মিলিগ্রাম ইকজেকসন দিয়ে অনেক সময় রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অনেকে চিকিৎসার প্রারম্ভে 100 মিলিগ্রাম হাইড্রোকর্টিসোন হেমিসাকসিনেট শিরাপথে ইনজেকশন দিয়ে পরবর্তী চিকিৎসা আরম্ভ করা পছন্দ করেন।

তবে কর্টিসোন ব্যবহারে অনেক সময় খারাপ ফলও দেখা যায়। অনেক সময় পাকস্থলীর ক্ষত থেকে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা ঘুমন্ত ডায়াবেটিস প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার কখনও হাঁপানি চিকিৎসা করতে গিয়ে বহুদিনের পুরাতন বা সেরে যাওয়া ক্ষয় রোগ নতুন করে দেখা যেতে পারে। বহুদিন ব্যবহারে রোগী মোটা হয়ে যেতে পারে, মুখ হয়ে যায় চাঁদের মত পরে কুশিং রোগ ( Cushing Syndrome ) দেখা দিতে পারে।

এই সব প্রতিক্রিয়া এড়ান সম্ভব যদি এরোসল পদ্ধতিতে কর্টিসোন শ্বাসপথে দেওয়া সম্ভব হয়। আজকাল এরোসল পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য বেকলোমেথাসোন ডাইপ্রোপায়োনেট ( Beclomethasone dipropionate ) নামে এক ধরনের কর্টিসোন পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি চাপে বেকলোমেথাসোন 0 84 মিলিগ্রাম মাত্রায় শ্বাসপথে প্রবেশ করে। একবারে দুটি চাপ যথেষ্ট—3-4 ঘণ্টা তার কাজ থাকে। দিনে 3-4 বার ব্যবহার করা যেতে পারে ; প্রয়োজন হলে আরও বেশীবার ব্যবহার করা যেতে পারে ; কিন্তু 20 বারের বেশী ব্যবহার কখনও করা উচিত নয়।

এই পদ্ধতিতে কর্টিসোন প্রয়োগ করলে তা রক্তে প্রবেশ করে না। কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কাজ করে প্রধানত শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লীর উপর। অ্যালার্জি বা বীজাণু সংক্রমণ জনিত প্রদাহ খুব তাড়াতাড়ি কমতে সাহায্য করে এবং শ্বাসপথে বায়ুচলাচল সহজ হয়। তবে এই ওষুধ আমাদের দেশে এখনও সহজে পাওয়া যায় না।

**ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট :**

অ্যালার্জেনের প্রতিক্রিয়া যে হাঁপানি রোগের অন্যতম প্রধান কারণ এ বিষয়ে আজ আর দ্বিমত নেই। ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট এই প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম। ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট হোল 1, 3-বিস-2 হাইড্রক্সি প্রোপেন'-এর সোডিয়াম সল্ট্।

কক্‌স্‌ 1969 সালে প্রথম জানালেন কি ভাবে এই ওষুধ হাঁপানির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। সম্ভবত ক্রোমোগ্লাইকেট্‌ মাস্‌ট্‌ কোষের আবরণকে স্থিতিশীল করে এবং তার ভিতর থেকে হিষ্টামিন ( Histamin ) সমন্বিত দানাগুলিকে বেরোতে দেয় না ( অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে সাধারণত তাই হয়ে থাকে ) । তবে ক্রোমোগ্লাইকেট ব্যবহারের আগে যদি অ্যাণ্টিজেন শরীরে প্রবেশ করে থাকে, তখন এ-ওষুধ কাজ করে না ।

ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট কোন সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজক কিংবা হিষ্টামিন বিরোধী অথবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ নয় । পাকস্থলী বা অন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই ওষুধ শরীরে যায় না । শ্বাসপথে পাউডার হিসাবে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ( স্পিন হেলার –Spinnaler ) শতকরা ভাগ ওষুধ শরীরে প্রবেশ করে এবং তাতেই হাঁপানি প্রতিরোধ হয় । বহুবছর এই ওষুধ ব্যবহার করে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা বিষক্রিয়া দেখা যায় নি । কেউ কেউ গলা শুকিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্য পাউডার শুঁকতে দিয়েও গলা শুকিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে । গর্ভাবস্থায় খরগোশকে এই ওষুধ প্রয়োগ করে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা শোনা যায় নি ।

এই ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতি খুব সরল । সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে সুস্থ অবস্থায় একটি ক্যাপসুলের ভিতরে গুঁড়ো ওষুধ স্পিন হেলারের সাহায্যে মুখ দিয়ে জোরে শ্বাসনলীর মধ্যে টেনে নিতে হবে । ছয় থেকে আট ঘণ্টা অন্তর আরও দুই বা তিন বার এইভাবে শ্বাসনলীতে ক্রোমোগ্লাইকেটের গুঁড়ো যদি টেনে নেওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জিজনিত হাঁপানি প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

বিভিন্ন শ্রেণীর ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য রোগীর মুখের কথা বিশ্বাস না করাই ভাল । সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হোল রোগী সজোরে শ্বাস ত্যাগ করার সময় নিঃসৃত বায়ু (Forced Expiratory Volume measurement ) প্রথম সেকেণ্ডে কত হয় তা মেপে দেখা ( F.E.$V_1$. ) । ব্রঙ্কাসের ব্যাস বৃদ্ধি করার ওষুধ শুধু তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন পরীক্ষায় প্রমাণ হবে যে ওষুধে রোগীর শ্বাসক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্যথায় কাজ না হওয়া সত্ত্বেও যদি ক্রমশ ওষুধের মাত্রা বাড়ান হয় তার ফল মারাত্মক হতে পারে ।

**হাঁপানি আক্রমণের সময় কি ভাবে চিকিৎসা করা হবে :**

রোগী যে অবস্থায় থাকলে সুস্থ বোধ করে সেই অবস্থাতেই থাকতে দেওয়া উচিত । যদি সম্ভব হয় স্যালবুটামল এরোসল পদ্ধতিতে স্প্রে করে

শ্বাসনলীতে দিতে হবে।* সাধারণত একবার স্প্রে করে, দরকার মনে হলে 5 মিনিট পরে আর একবার স্প্রে করা যেতে পারে। যাদের এই ওষুধে হাঁপানি কমে, তাদের ঐ প্রশমিত অবস্থা 3-4 ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। ঐ সময়ের পরে যদি হাঁপানি থাকে স্যালবুটামল 4 মিলিগ্রাম বড়ি বা টারবুটালিন 2·5-5 মিলিগ্রাম বড়ি খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে স্প্রে করার সুবিধা এই যে অল্প ওষুধে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

যে সব রোগীর স্যালবুটামল বা টারবুটালিন এ ভাল ফল যায় না সেই সব ক্ষেত্রে অ্যামাইনোফাইলিন 250-500 মিলিগ্রাম, 10-20 মিলিলিটার পরিস্রুত জল বা গ্লুকোজ মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত করে খুব ধীরে শিরাপথে ইনজেকসন দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া স্যালবুটামল চামড়ার নীচে বা পেশীর মধ্যে ইনজেকসন দেওয়া যায়।

যদি এই পদ্ধতিতেও আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে প্রেড্নি-সোলোন 15 মিলিগ্রাম 24 ঘন্টায় চার বার ( মোট 60 মিলিগ্রাম খাওয়ানো যেতে পারে। দ্বিতীয় দিন থেকে প্রতিবারে একটি করে বড়ির মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। তারপরে একইভাবে একটি করে বড়ি কম করে প্রতি 6 ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। এই ভাবে প্রেডনিসোলোন চলবে 5-7 দিন। তারপরে একটি করে আট ঘন্টা অন্তর, আরও পরে একটি করে বারো ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। অতঃপর প্রেডনিসোলেন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

যারা গুরুতর হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে হাইড্রোকর্টিসোন হেমিসাক্সিনেট 200 মিলিগ্রাম শিরাপথে ইনজেকসন দেওয়াই শ্রেয়। দু-ঘণ্টা পরে পুনরায় ঐ ইনজেকসন দিতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসার প্রথম বারো ঘন্টায় 100 মিলিগ্রাম প্রেডনিসোলোন বড়ি খাওয়াতে হবে। এই অবস্থায় একই সময়ে 0·5% স্যালবুটামল 40% অকসিজেনের সঙ্গে সবিরাম পজিটিভ চাপে ( I.P P.B ), মুখে হালকা মাস্ক দিয়ে প্রতি ঘন্টায় 3 মিনিট মত সময় শ্বাসনলীতে প্রয়োগ করতে হবে। এই ভাবে অকসিজেন প্রয়োগের সুযোগ যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে স্যালবুটামল 500 m c.g মাইক্রোগ্রাম আট ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যেতে পারে। অথবা রোগীর শরীরে যে টিউবের দ্বারা গ্লুকোজ-স্যালাইন শিরাপথে ইনজেকসন দেওয়া হয় তার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া

---

* স্যালবুটামল স্প্রে বিদেশে খুবই ব্যবহার হচ্ছে ; তবে এদেশে এখনও সহজলভ্য নয়।

যেতে পারে। যেখানে রোগীর অকসিজেনের অভাব দেখা যায় সেখানে অকসিজেন এমন ভাবে দিতে হবে যাতে ধমনীতে কার্বন-ডাই-অকসাইড খুব বেশী না কমে যায় ; যা স্বাভাবিক সেই রকম বা তার চেয়ে কিছু কমান যেতে পারে।

হাঁপানি রোগীরা বেশী জল খেতে চায় না, আর জল না খাওয়ার জন্য রক্ত ঘন হয়ে যায়। শ্বাসনলীতে কফ শুকিয়ে যায় এবং রক্তে পি-এইচ (pH) কমে যায়। এই অবস্থায় প্রয়োজন মত গ্লুকোজ স্যালাইন এবং 7·5% সোডাবাইকার্ব 50-100 মিলিলিটার শিরাপথে ইনজেনসন দেওয়া যেতে পারে। এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি ধমনীতে কার্বন ডাই-অকসাইড পারাদণ্ডের 53 মিলিমিটার পর্যন্ত উঠে যায়, তখন ট্রেকিয়াতে টিউব দিয়ে সবিরাম পজিটিভ চাপে অকসিজেন প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

অবিরাম তীব্র হাঁপানির আক্রমণে যাঁরা গুরুতর অসুস্থ তাঁদের ক্ষেত্রে উপরে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও অ্যান্টিবায়োটিকের কথা মনে রাখতে হবে, কারণ এদের শ্বাসপথে বীজাণুর আক্রমণ হতে দেখা যায়। অ্যামপিসিলিন 250-500 মিলিগ্রাম অথবা টেট্রাসাইক্লিন 250-500 মিলিগ্রাম বা ক্লোরামফেনিকল 250 মিলিগ্রাম 6 ঘন্টা অন্তর দেওয়া যেতে পারে সাত থেকে দশদিন পর্যন্ত।

হাঁপানি রোগীদের ঘুমের ওষুধ না দেওয়াই ভাল। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, ডায়াজেপাম 5 মিলিগ্রাম দেওয়া যেতে পারে। মরফিন জাতীয় ওষুধ কখনও দেওয়া উচিত নয়।

রোগী যখন সুস্থ হয়ে ওঠে এবং যদি দেখা যায় সেই বিশেষ রোগীর হাঁপানির উৎস অ্যালার্জি, সেক্ষেত্রে ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ক্যাপসুল স্পিনহেলার যন্ত্রের সাহায্যে ফুটো করে, ভিতরের পাউডার জোরে শ্বাসনলীর ভিতরে টেনে নিতে পারলে অ্যালার্জি জনিত হাঁপানি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**ক্রনিক হাঁপানির চিকিৎসা কিভাবে করা উচিত :**

যারা বরাবর হাঁপানিতে ভোগে তাদের মধ্যে কিছু রোগী শ্বাসপথে স্যালবুটামল বা কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ স্প্রে করলে সুস্থ থাকে। তবে আমাদের দেশে এরোসল স্প্রে এখনও পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ হাঁপানি রোগীদের নির্ভর করতে হয় এফিড্রিন 30 মিলিগ্রাম বড়ির উপর। এফিড্রিন

বড়ি দিনে খেতে হবে দুই থেকে চারবার। অনেক ক্ষেত্রে উপকার হলেও কোন কোন সময়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়।

আজকাল স্যালবুটামল 2-4 মিলিগ্রাম বা টারবুটালিন 2.5-5 মিলিগ্রাম ব্যবহার করে বহুরোগী উপকার পাচ্ছেন। দরকার মত এফিড্রিন, স্যাল-বুটামল/ টারবুটালিন এবং থিয়োফাইলিন 200 মিলিগ্রাম বড়ি দিনে তিন বার পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। খুব অল্প মাত্রায় প্রেড্‌নিসোলোন বড়ি ( 2·5-5 মিলিগ্রাম ) দিনে দুই বা তিনবার ব্যবহার করে বহুক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। তবে এই সব ওষুধ ব্যবহারে অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায় ; সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ দেখা গেলেই মাত্রা কম করে দেওয়া ভাল। প্রতিক্রিয়া এড়াতে হলে স্যালবুটামল ও বেকলোমেথাসোন এরোসল পদ্ধতিতে স্প্রে করা বেশ নিরাপদ। অনেক কুণিক হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির ইতিহাস খুঁজে না পেলেও ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট-20 মিলিগ্রাম 24 ঘণ্টায় তিনবার শ্বাসপথে জোরে টেনে নিয়ে হাঁপানি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

উপরে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হল তার যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করার পর রোগী হয়ত বলতে পারেন যে ওষুধে কাজ হয়েছে, তিনি আরাম অনুভব করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রোগীর কথায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন না করে ওষুধ ব্যবহারের আগে ও পরে এফ-ই-ভি$_1$ (F.E.V$_1$ ) পরিমাপ করে সেই বিশেষ ওষুধে কাজ হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা উচিত। যে ক্ষেত্রে কাজ হবে সেখানে টাইডাল ভলুম ( Tidal Volume ) বাড়বে এবং এফ-ই-ভি$_1$ অন্তত শতকরা 30 ভাগের উপর বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সব ওষুধেই কম-বেশী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে তবেই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

রোগ হওয়ার সময় চিকিৎসা করানো ছাড়া রোগ যাতে আক্রমণ না করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কয়েক প্রকার অ্যালার্জেন এবং অ্যালার্জি সম্পূর্ণ এড়ান সম্ভব না হলেও যে টুকু সম্ভব সেই চেষ্টা করতে হবে। পোলেন বা ছত্রাক জাতীয় অ্যালার্জেন এড়ান সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে ঘরের ধুলো, পশুপাখীর মল ও লোম, অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বিশেষ ওষুধ ও খাদ্যবস্তুর অ্যালার্জেন এড়ান বিশেষ কঠিন নয়।

এ ছাড়া ডাই-সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট-এর গুঁড়ো শ্বাসনলীতে জোরে টেনে নিতে পারলে অ্যালার্জিজনিত হাঁপানি প্রতিরোধ করা সম্ভব। সংবেদনশীলতা কমানর কথা আগেই বলা হয়েছে। যদি দোষী অ্যালার্জেনকে ঠিকমত খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে এই পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে। অবশ্য এই চিকিৎসাপদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শ্বাসপথে বীজাণু আক্রমণ হলে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে।

অতিরিক্ত পরিশ্রম সময় সময় হাঁপানির কারণ হতে পারে। সেইজন্য বেশী পরিশ্রম না করাই ভাল।

ধূমপান অনেক রোগীর শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটায়—ধূমপায়ীদের সংসর্গ এড়িয়ে চলাই সঙ্গত।

অনেক সময় মানসিক চাপের জন্য হাঁপানি হয়। মানসিক চাপের শিকার না হয়ে যতদূর সম্ভব মন খুশী রাখার চেষ্টা করতে হবে। কোন রকম ভাবপ্রবণতার বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নয়। প্রয়োজনে ডায়াজেপাম 2 5—5 মিলিগ্রাম 24 ঘন্টায় 2-3 বার সেবনে এই চাপ কম হতে পারে।

পরিশেষে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একজিমা, অ্যালার্জি ও হাঁপানি রোগের যে বংশানুক্রমিক ধারা আছে, এই তথ্যে বিতর্কের অবকাশ নেই। সেইজন্য পিতা-মাতা যখন তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ করবেন, আগে খোঁজ নেওয়া দরকার অন্য পরিবারে ঐ জাতীয় কোন রোগের ইতিহাস আছে কিনা। যদি এক দিকের পরিবারে অ্যালার্জি থাকে চারটি সন্তানের মধ্যে একজন বা দুজন পরবর্তীকালে অ্যালার্জি বা হাঁপানিতে আক্রান্ত হতে পারে; কিন্তু যদি দুই তরফে ঐ জাতীয় রোগ থাকে সেই সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেকগুণ। এমন কি একটি মাত্র সন্তানও ঐ রোগের কবলে পড়তে পারে। যেক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে নিজেরা বিয়ে ঠিক করবেন সেখানে এই ইতিহাসটি খোলাখুলি জেনে নেওয়া ভাল। তা নাহলে পরবর্তী জীবন নিজেদের জীবনে তো বিষময় হবেই, অনাগত সন্তানেরও হাঁপানি রোগ কবলিত হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। সেই কথা মনে রেখে কোনরকম গোপনতার আশ্রয় না নিয়ে বিবাহের প্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া উচিত।

---

# গ্রন্থপঞ্জী

1. Singer, Charles and Underwood, E.A. A Short History of Medicine. 2nd. Ed. Oxford University Press, p. 428.
2. Crofton John, and Douglas, Andrew. Respiratory Diseases, 2nd. Ed. Blackwell Scientific Publications, p. 1.
3. Remington, J.S ; Vosti, K.L ; Lietze. A and Zimmerman, A.L. Jn. Cliu. Invest. (1964), 43, 1613.
4. Dalhamn, T ; Acta Physiol Scand (1956) 36 (supp), 123.
5(a). Ide, G ; Suntzeff, Valentina and Cowdry, E.V. Cancer (Philad.) (1959) 12,473.
5(b). Dalhamn, T ; Am. Rev. Resp. Dis (1966) 93(supp), 108
5(c). Bang, F.B . Bang, B.G ; Faord, M.A . Am. Rev. of Resp. Dis (1966) 93, (supp), 142.
6. Williams, D.A. International Text book of Allergy (1959) Ed. Jamar, J.M. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
7. Viswanathan, R ; Transactions of the World Asthma Conferance (1965) p. 19.
8. Graham, P.J ; Rutter, M.L ; Yule, W and Pless I.B. Br. Jn Prev. Soc. Med (1967) 21, 78
9. Schild, H.O ; Hawkins, D.P ; Monger, J.L and Herxheimer, H. Lancet (1951) 2, 376
10. Crofton, John and Douglas Andrew. Respiratory Diseases, 2nd Ed. Blackwell Scientific Publication, Oxford p. 75.
10(a-b).Turner, Warwick Margaret. Br.Jn. Hosp. Med (1973)9,19.
11. Crofton, John and Douglas Andrew. Respiratory Diseases, 2nd. Ed. Blackwell Scientific Publications. p. 76.
12. Mc Combs, R.P. New Eng Med Jn (1972) 286, p. 1186, 1245.

13. Jn. Br. Tho and Tub Assn. (1974) 4, (suppl). p. 28.
14. Jaggi, O.P. Asthma and other Allergies (1974), Orient Longmans. p. 16.
15. Singh, Kartar and Shivpuri, D.N. Aspects of Allergy and Applied Immunology (1968) 2,75.
16. Shivpuri, D.N ; Viswanathan, R ; Dua, K.L. Ind, Jn. of Med. Res. (1962) 48 ; 15-21.
17. Shivpuri, D.N. Aspects of Allergy and Applied Immunology (1967) 1 ; 98.
18. Jaggi, O.P. Asthma and other allergies, (1974) Orient Longmans, p. 27.
19. Editorial, Br. Med. Jn (1971) 2 ; 601
20. Jaggi, O.P. Asthma and other Allergies (1974), Orient Longmans, p. 32.
21. Bernecker, C. Acta Allergy (1970) 25 ; 392
22. Speer, F. The Allergic Child (1962). p. 106.
23. Chobot, R ; Uvitsky 1. H. and Dundy H. J. Allergy (1951) 22, 106.
24. Rodin, H.H and Bluefarb, S.M. Jn. Indiana Med Assn. (1951) 44, 846.
25. Rajka, E. Jn. Allergy (1942) 13 ; 327.
26. Editorial. Jn. Am., Med Assn. (1954) 155 ; 1621
27. Jaggi O.P. Asthma and other Allergies (1974). Orient Longmans. p. 46.
28. Ibid—p. 47.
29. Reisman, R.E. Jn. Allergy (1970) p. 46.
30. Editorial, Br. Med. Jnl. (1969) 3 ; 729
31. Editorial, Br. Med. Jnl. (1969) 1 ; 6.
32. Sosman, A.J ; Schlueter, D.P ; Fink, J.N and Barboriak, J.J. New Eng. Jn of Med (1969) 281 ; 977.
33. Pickering, C.A.C. Proc, Roy. Soc.M (1972) 65 ; 272

34. Peters, J.M. Proc. Roy. Soc. Med. (1970) 63 ; 372

35. Tullis D.C H. New Eng. Jn. Med. (1970) 282 ; 370

36. Herxheimer, H ; Hyde, H.A ; Williams, D.A. Lancet (1969) 2 ; 131

37. Bernton, H.S ; McMohon, T.F. and Brown, H Brit Jn Ch. Dis. (1972) 66 ; 61

38. Pearson, R.S.B. Proc. Roy. Soc. Med. (1968) 61 ; 467

39. Leigh, D and Marley, E. Brocnhial Asthma ; A Genetic, Population and Psychiatric studies (1967) Pergamon Press, Oxford.

40. Crofton, John and Douglas, Andrew. Respiratory Diseases (1975). Blackwell Scientific Publications. Oxford. p. 433

41. Swineford, O (Jr.) Johnson, E.R. (Jr.) Cook, H.M. (Jr) and Ochota, L. Ann Allergy (1962) 20 ; 155

42. Crofton, John and Douglas, Andrew. Respiratory Diseases (1975). Blackwell Scientific Publications, Oxford. p. 433.

43. Trousseu, A. Lectures on Clinical Medicine, Vol xxxv (1868) The New Sydenham Society, London. p. 625

44. Graham, P.T ; Rutter, M.L ; Yule, W and Pless, I.B. Br Jn. Prev. Soc. Med. (1967) 21 ; 78.

45. Rees, L Hospital Medicine (1967) 1 ; 1101

46. Smith, Margaret. M ; Colebatch, H.J.H and Clarke, P.S. Am. Rev. Resp. Dis (1970) 102 ; 236.

47. Luparello, T ; Lyons, H.A ; Bleeker, E.R and Mc Fadden, E.R. (Jr.) Psychosomatic Med (1968) 30 ; 819

48. Anderson, Sandra D ; Mc Evoy J.D.S ; Bianco, S. Am. Rev. Resp. Dis (1972) 106 ; 30

49. Fisher, H.K. ; Holton, P ; Buxton, R.J and Wadel, J.A. Am. Rev. Resp. Dis (1970) 101 ;885

50. Fitch, K.D. and Morton, AR. Br. Med Jn (1971) 4, 577

51. Hafez, F.F and Crompton, G.K Br. Jn. Dis chest (1968) 62 ; 41
52. Clarke P.S. Br. Med. Jn (1971) 1 ; 317.
53. Aas, K. Arch. Dis child (1969) 44 ; 1
54. Williams, D.A ; Lewis-Faning, E ; Rees, L ; Jacobs, J and Thomas, A. Acta Allergy (1958) 12 ; 376.
55. Cardell, B.S. and Pearson, R.S.B. Thorax (1959) 14 ; 31
56. (a) Hinshaw, H and Murray J.F. Diseases of the Chest. (1980) 4th Ed.W.B. Saunders and Co. p. 539
56. (b) Fraser, Robert, Gr and Peter Pare, J.A. Diagnosis Diseases of the Chest Vol. III 2nd Ed. W.B. Saunders and Co. p. 1341
57. Williams, D.A. and Leopold, J.G. Acta Allergy (1959) 14 ; 83.
58. (a) Hinshaw, H. and Murray J.F. Diseases of the Chest (1980) 4th Ed. W.B. Saunders and Co. p. 540.
58. (b) Hossain, S. uraiya, Am. Rev. Resp. Dis (1973) 107 ; 99
59. Connel, J.T. Jn. Am. Med. Assn (1971) 215 ; 769.
60. Soutar. C.A ; Costello, J ; Ijaduola, O and Turner-Warwick, -M. Thorax (1975) 30 ; 436
61. Knowles, G.K. and Clark, T.J.H Lancet (1973) 2, 1356.
62. Pepys, J. in Clinical aspects of immunology. (1968) 2nd Ed. Gell, P.G. and Coombs, R.R.A. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
63. Citron, K.M ; Frankland, A.W. and Sinclair J. D. Thorax (1958) 13 ; 229.
64. Shivpuri, D.N. in Common Allergic diseases and Allergens (1980)
65. Karetzky M.S. Am. Rev. Resp. Dis (1975) 112 ; 607.
66. Usher, D.J ; Shephard, R.J. and Dugan, T. Thorax (1976)

29 ; 685.

67. Szczeklik, A ; Turowaska, B ; Czerniawska—Mysik, G ; Opolska, B ; Nizaukowska, E. Am. Rev. Resp. Dis (1974) 109 ; 487

68. Baker, J. W ; Yerger, S and Seger, W. E. Proc. Mayo Clinic (1976) 51 ; 31

69. Gunstone, R.F. Thorax (1971) 26 ; 39.

70. Crofton, John and Douglas, Andrew. Respiratory Diseases. 2nd Ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford p. 444.

71. Crofton, J.W ; Livingstone, J. L ; Oswald, N.C and Roberts, A.T.M. Thorax ( 1952 ) 7 ; 1

72. Cohen, M.B and Abram, L.E. J. Allergy (1948) 19 ; 165

73. Ogilvie, A.G. Thorax (1962) 17 ; 183

74. Bierman, C.W. Am. Jn. Dis. of Child. (1967) 114 ; 42

75. Derbes, V.J. Weaver, N.K and Cotton, AL. Am. Jn. of Med. Sc. (1951) 222 ; 88

## Glossary — শব্দ কোষ

| | |
|---|---|
| Alveolus | বায়ুথলি |
| Atelectasis | বায়ুশূন্য ফুসফুস |
| Capillary | কৌশিক জালিকা |
| Circular fibres | গোলাকার পেশী |
| Extrinsic | বহির্জাত |
| Fungus | ছত্রাক |
| Glottis | শ্বাসরন্ধ্র |
| Hypersensitive | অতিসংবেদনশীল |
| Intrinsic | অন্তর্জাত |
| Larynx | স্বরযন্ত্র |
| Mast cells | মাস্‌ট্‌ কোষ |
| Mite | মাইট |
| Mucous gland | শ্লেষ্মা গ্রন্থি |
| Mucous membrane | শ্লেষ্মা ঝিল্লী |
| Non-specific | অনির্দিষ্ট |
| Receptor | গ্রাহক |
| Rhinitis | নাসিকা প্রদাহ |
| Silent chest | নীরব বক্ষ |
| Sinus Tachycardia | দ্রুত হৃৎস্পন্দন |
| Skin Test | ত্বকের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা |
| Specific | সুনির্দিষ্ট |
| Spiral fibres | পেঁচাল পেশী |
| Spontaneous Pneumothorax | স্বতোৎসারিত নিউমোথোরাক্স্ |
| Status Asthamaticus | অবিরাম তীব্র হাঁপানি |
| Stimuli | উত্তেজক |

# শুদ্ধিপত্র

| পৃঃ | লাইন | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ২০ | ১৭ | 07 | 0·7 |
| ২০ | ২১ | 1 19,000 | 1 : 10,000 |
| ২১ | ১ | 99 খৃঃ | 199 খৃঃ |
| ১৯ | ৩ | 18 9 | 1869 |
| ২২ | ২৬ | কযেক | কয়েক |
| ২৩ | ১৬ | Detergnt | Detergent |
| ২৯ | ১৬ | 58 | 58 (a) |
| ৩৫ | ১৮ | Respirations | Respiratory |
| ৩৭ | ২৬ | (চিত্র—10) | ( চিত্র—1Cক ) |
| ৪৮ | ১৭ | অ্যালার্জি | অ্যালার্জি |
| ৬৪ | ১৩ | soetharine | Isoetharine |

## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা



চার টাকা